শ্রুতিতেও প্রায়ই একই ঔষধের বাতরক্ত ও কুষ্ঠ নাশকত্ব উক্ত হইয়াছে।

এস্থলে একটী তর্ক উঠিতে পারে, যদি চিকিৎসারই পার্থক্য না থাকে, তবে ভেদ-নির্ণয়ের কি প্রয়োজন? চিকিৎসার ভেদের জন্যই ত রোগের পার্থক্য নির্ণয় আবশ্যক। কিন্তু এ তর্ক সঙ্গত নহে। চিকিৎসার পার্থক্য করা না হইলেও, প্রকৃতি ও পরিণামের পার্থক্য আছে। কুষ্ঠরোগ দারুণ সংক্রামক এবং পাশ্চাত্য মতে সম্পূর্ণ স্বীকৃত * না হইলেও আয়ুর্ব্বেদ মতে বংশানুক্রমিক। সুশ্রুত বলিয়াছেন—

স্ত্রীপুংসয়োঃ কুষ্ঠদোষাদ্ দুষ্ট শোণিতশুক্রয়োঃ
যদপত্যং তয়োর্জাতং জ্ঞেয়ং তদপি •
কুষ্ঠিতম্—(কুষ্ঠ নিঃ)

অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষের কুষ্ঠ রোগে শুক্র ও শোণিত দূষিত হইলে তাহাদের যে সন্তান জন্মে, সেও কুষ্ঠ রোগ গ্রস্ত হয়। টীকাকার ডল্লনের মতে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত স্ত্রী-পুরুষের বীজ শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। তাহাদের অপত্য জন্মে না, এই মত পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সম্মত। কিন্তু বীজ সম্পূর্ণ নষ্ট না হইলে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত সন্তান উৎপন্ন হয়। অতএব সমাজের ও জাতির মঙ্গলের জন্য কুষ্ঠরোগীকে তদনুযায়ী নিয়মিত ও পৃথগ্‌ভূত রাখা একান্ত প্রয়োজন। ভেদ-নির্ণয় ব্যতীত তাহা সম্ভব নহে। আর চিকিৎসার প্রকৃতই পার্থক্য না থাকিলে বসন্ত চিকিৎসকদের মত স্বতন্ত্র কুষ্ঠ চিকিৎসক গণের (অন্ততঃ সেই নামে পরিচিত) আবির্ভাব ঘটিত না। শাস্ত্রে যখন অধিকার-ভেদ উপদিষ্ট হইয়াছে। রোগের ভেদ-নির্ণয় ব্যতীত তাহার চিকিৎসার ভেদ নির্ণয় করাও অসম্ভব, সন্দেহ নাই।

এক্ষণে কুষ্ঠ ও বাতরক্তের ভেদ-নির্ণয় সম্বন্ধে প্রচলিত ও বহুসম্মত মত সমূহ অগ্রে আলোচনা করা যাউক।

তস্য স্থানং করৌ পাদাবঙ্গুল্যঃ সর্ব্বসন্ধয়ঃ।
কৃত্বাদৌ হস্তপাদেতু মূলং দেহে বিধাবতি।
[চরক—চিঃ স্থাঃ, বাঃ শোঃ চিঃ অঃ]

অর্থাৎ হস্ত ও পদদ্বয়, অঙ্গুলী ও সন্ধি সমূহ বাত রক্তের স্থান। ইহা হস্ত ও পদে আরম্ভ হইয়া দেহে বিস্তৃত হয়।

* Certain Physiopathological qualities, predisposing to leprosy, may be inherited * * Physiological pecularities and susceptibilities may, but parasites cannot be inherited. It is true the ovum may be infected by a germ as in Syphilis, but infection is not heridity * * * Without absolutely denying the possibility of ovum infection, the probability is that such an event is very rare. * * Another powerful argument against the doctrine of heridity is, the circumstance, that lepers become sterile early in the desease.

Sir Patirick Manson
Tropical Deseases,
New edition. (1914)

কুষ্ঠরোগোৎপত্তির অনুকূল কতকগুলি প্রকৃতি ও দোষ সংক্রমিত হইতে পারে * * শরীরপ্রকৃতি ও রোগ-প্রবণতা সংক্রমিত হইতে পারে বটে, কিন্তু রোগ বীজ সংক্রমিত হওয়া সম্ভব নহে। অবশ্য উপদংশের মত রোগে স্ত্রীবীজ (আর্ত্তব) রোগ বীজাণু দুষ্ট হইতে পারে, কিন্তু রোগ সংক্রমণ এবং পুরুষানুক্রম এক কথা নহে * * আর্ত্তববীজ ব্যাধি দুষ্ট হইবার সম্ভাবনা সম্পূর্ণ অস্বীকার না করিতে পারিলেও তাহা অত্যন্ত বিরল একথা বলা যায়। (কুষ্ঠরোগের) বংশানুক্রমের বিরুদ্ধে আর একটী গুরুতর তর্ক এই যে, কুষ্ঠরোগীগণের রোগাক্রমণের অল্পকাল মধ্যেই অপত্যোৎপাদন শক্তি নষ্ট হইয়া যায়।

সুতরাং এ তত্ত্ব পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক মতেরও বিরুদ্ধ হইতেছে না।

পাদয়োর্মূলমাস্থায় কদাচিদ্ধস্তয়োরপি।
আখোর্বিষমিব ক্রুদ্ধং তদ্দেহমুপসর্পতি
(সুশ্রুত—বাতব্যাঃ নিঃ)।

অর্থাৎ "বাতরক্ত হস্ত ও পদদ্বয়ের মূলে অধিষ্ঠান করিয়া প্রকুপিত মূষিক বিষের মত দেহে বিস্তৃত হয়।

বাগ্‌ভট বলিয়াছেন "তচ্চপূর্ব্বং পাদৌ প্রধাবতি" অর্থাৎ বাতরক্ত প্রথমে পদদ্বয় আক্রমণ করে। মাধবনিদানের টীকাকার বিজয় রক্ষিত রক্তগত বাতের সহিত বাতরক্তের পার্থক্য নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া বলিয়াছেন,—"বাতরক্তে তু স্বকারণা দুভাবপি হস্ত্যাদিগমনকুপিতৌ বিশিষ্ট সংপ্রাপ্ত্যা হস্তপাদগতাবেব বাতরক্তাখ্যং বিকারং জনয়তঃ"। অর্থাৎ স্ব স্ব প্রকোপক কারণ বশতঃ, হস্তী প্রভৃতিতে গমন দ্বারা কুপিত বায়ু ও রক্ত, বিশিষ্ট সংপ্রাপ্তি বশতঃ হস্তপদে অবস্থিত হইয়াই বাতরক্ত নামক রোগ উৎপাদন করে।

এই সকল বচন ও নির্দ্দেশ অনুসারে, পদমূল ও হস্তমূল হইতে প্রকাশ ও প্রসারই বাতরক্তের ভেদক লক্ষণ বলিয়া অনেক চিকিৎসকের ধারণা। কিন্তু এই লক্ষণ সম্যক্ অবিসম্বাদী বা সংশয় নিবারক নহে। মুখাদি অন্যস্থানে (কুষ্ঠ) রোগ আরম্ভ হইলে, এই লক্ষণের দ্বারা বরং বাতরক্তের ব্যাবৃত্তি বা রোগ নির্ণয় করা গেল, কিন্তু যে স্থলে পদমূলে বা হস্ত মূলে কুষ্ঠ আরম্ভ হয়, সে ক্ষেত্রে এই লক্ষণ অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়ে। কুষ্ঠ যে পাদমূল বা হস্ত মূলে হইবে না, এরূপ নিষেধ ত কুত্রাপি নাই। বাতরক্তের মত কুষ্ঠের সংপ্রাপ্তি ও স্থান, কোন বিশেষ সীমাবদ্ধ নহে। সুশ্রুতেই কুষ্ঠের পিত্ত লিঙ্গের মধ্যে অঙ্গুলী পতন ও করভঙ্গ উক্ত হইয়াছে। ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধও বটে।

কাহার কাহারও বিশ্বাস, বাতরক্ত বাত ও রক্তদুষ্ট মাত্র। ইহাতে কুষ্ঠের মত মাংস পচা, অস্থি ভঙ্গ প্রভৃতি গুরুতর লক্ষণ প্রকাশ পায়না কিন্তু তাহা যুক্তি সঙ্গত নহে। মাংসক্ষয় ও মাংস কোথ বাতরক্তের বিশেষ উপদ্রব।

"...মাংসকোথশিরাগ্রহাঃ...
এতৈরুপদ্রুতং বর্জ্জ্যম্"
(চরঃ বাঃ শোঃ চিঃ)

অর্থাৎ মাংস পচা, শিরাসঙ্কোচ ইত্যাদি উপদ্রব-পীড়িতকে ত্যাগ করিবে। "আজানুস্ফুটিতং যচ্চ প্রভিন্নং প্রস্রুতঞ্চ যৎ, উপদ্রবৈশ্চ যজ্জুষ্টং প্রাণমাংসক্ষয়াদিভিঃ, শোণিতং তৎ অসাধ্যং স্যাৎ...অর্থাৎ সুশ্রুত বলিয়াছেন যে, যে বাতরক্তে জানুপর্য্যন্ত (ত্বক্) ফাটিয়া বা (মাংসাদি) বিদীর্ণ হইয়া যায়, স্রাব হইতে থাকে এবং বলও মাংসক্ষয় প্রভৃতি উপদ্রব হইয় থাকে, সেই বাতরক্ত অসাধ্য। [সুশ্রুত বাং ব্যাং নিং] অতএব বাতরক্তেও গুরুতর লক্ষণের অসদ্ভাব নাই। অস্থি ভঙ্গাদি কুষ্ঠের প্রায় চরম লক্ষণ কিন্তু রোগ নির্ণয়ের জন্য ততদিন অপেক্ষা করিলে চিকিৎসকের পূর্ব্বে স্বয়ং রোগীরই চৈতন্য-সঞ্চারের অধিক সম্ভাবনা।

অতএব কুষ্ঠ ও বাতরক্তের ভেদ-নির্ণয় করিতে হইলে, উভয়েরই (অন্ততঃ কুষ্ঠের) এমন ভেদক লক্ষণ বাহির করিতে হইবে, যদ্দারা নিঃসংশয়রূপে সর্ব্বস্থলে অচিরকালেই উভয়েরই স্পষ্ট পার্থক্য নিরূপিত হয় এবং সেই লক্ষণ বলিবার উদ্দেশ্যেই অদ্য এই প্রবন্ধের অবতারণা। কিন্তু সেই লক্ষণগুলি বলিবার পূর্ব্বে ইহা প্রতিপন্ন করা আবশ্যক যে, সেই লক্ষণ যথার্থই বিশিষ্ট ভেদক লক্ষণ।

আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে সামান্যাকারে কথিত লক্ষণ সমষ্টির মধ্য হইতে একটী বা দুইটী লক্ষণকে ইতরব্যবর্ত্তক বলিয়া নির্দ্দেশ মাত্রেই বিনা প্রমাণে সে কথা কেহই স্বীকার করিবেন না।

প্রমাণের কথা বলিতে হইলে, অগ্রে দেখা যাউক, এস্থলে কিরূপ প্রমাণ সম্ভব। চরক মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান, যুক্তি ও আপ্ত—এই চতুর্ব্বিধ প্রমাণ। যুক্তি অর্থাৎ অর্থাপত্তি, নৈয়ায়িকগণ স্বতন্ত্র প্রমাণ স্বীকার করেন না। নৈয়ায়িক ও সুশ্রুত সম্মত উপমানও সেইরূপ অনুমানের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া যাইতে পারে। অতএব স্থূলতঃ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আপ্ত এই ত্রিবিধ প্রমাণ বলা যায়। রোগ বিশেষ বিজ্ঞানীয় বিমানাধ্যায়ে মহর্ষি আত্রেয় ও বলিয়াছেন—"ত্রিবিধং খলু রোগ বিশেষ বিজ্ঞানং ভবতি তদ্যথা উপদেশঃ প্রত্যক্ষমনু-মানঞ্চ।" এস্থলে আপ্ত প্রমাণ সম্ভব নহে, কেননা আপ্ত বা ঋষিকৃত লক্ষণাবলীর মধ্যে গৌণমুখ্যভাব নির্দ্ধারণই এই বিচারের উদ্দেশ্য। তজ্জন্য স্বতন্ত্র বিশদ আপ্ত প্রমাণ থাকিলে, এত সংশয় ও গোলযোগ ঘটিত না। অনুমানও প্রত্যক্ষমূলক হওয়া আবশ্যক। অতএব প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যতীত আর উপায়ান্তর নাই। বিশেষতঃ প্রত্যক্ষফলকশাস্ত্র প্রামাণ্য প্রত্যক্ষ সিদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত।

"চিকিৎসিতজ্যোতিষতন্ত্রবাদাঃ
পদে পদে প্রত্যয়মাবহন্তি"

কিন্তু এক্ষেত্রে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেওয়া অতি দুরূহ। বিশেষতঃ শাস্ত্র বচন মাত্রাবলম্বী প্রত্যক্ষবিজ্ঞানক্রিয়াশূন্য আমার পক্ষে তাহা একেবারে অসম্ভব। অতএব অন্যের প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়া উপস্থাপিত করা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই, কিন্তু কাহার প্রমাণ প্রত্যক্ষ বলিয়া গ্রাহ্য হইবে? আমরা নিশ্চয়ই ঋষি ব্যতীত অন্যকে আপ্ত বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। *

আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসা-শাস্ত্র লৌকিক প্রত্যক্ষ বিজ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতি-ষ্ঠিত। অবশ্য তাহার সমস্ত সিদ্ধান্তই অভ্রান্ত বা পরীক্ষক ও প্রত্যক্ষদর্শীর ভ্রমপ্রমাদ দূষিত নহে,—একথা বলিতেছি না, কিন্তু মোটের উপর সেগুলির অধিকাংশই প্রত্যক্ষ মূলক—ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এখন পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রে সর্ব্ববাদীসম্মত যদি এমন কোন ভেদক লক্ষণ পাওয়া যায়, যাহা ঋষি বচনেও সুস্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে, তবে সেই লক্ষণ গুলিকে প্রকৃত ভেদক বা ইতর ব্যবর্ত্তক বলিয়া স্বীকার করিতে বোধহয় কাহারও অপত্তি হইবে না। (ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত,
কাব্যতীর্থ, কবিরত্ন।

* কিন্তু ন্যায়দর্শনের ভাষ্যকার বাৎস্যায়নমুনি স্বীকার করিতেন। "আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ" এই ন্যায়-সূত্রের ভাষ্যে বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন "আপ্তঃ খলু সাক্ষাৎ কৃতধর্ম্মা। যথাদৃষ্টস্য অর্থস্য চিখ্যাপয়িষয়া প্রযুক্ত উপদেষ্টা। সাক্ষাৎকরণমর্থস্যাপ্তি স্তয়া প্রবর্ত্তে ইত্যাপ্তঃ।" অর্থাৎ যিনি পদার্থের স্বরূপ সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়াছেন তিনি আপ্ত। ঋষি আর্য্য ও ম্লেচ্ছ সকলের পক্ষেই ইহা সমান লক্ষণ।

শারীর বায়ু।

—:*:—

(আয়ুর্ব্বেদ সভায় পঠিত।)

আয়ুর্ব্বেদে বায়ু কি, তাহা অবগত হওয়া প্রত্যেক চিকিৎসকের কর্ত্তব্য। কারণ বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মাই আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব। এই দেহর উৎপত্তি, বৃদ্ধি এবং বিনাশ—সমস্তই বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার কার্য্য। সুতরাং বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার স্বরূপ বিজ্ঞান এবং এই দেহে তাহাদের অবস্থিতি ও কার্য্য এবং তাহাদের প্রকৃতি-বিকৃতি, হ্রাস, বৃদ্ধি প্রভৃতি বিশেষরূপে জানিতে না পারিলে তিনি রোগ নির্ণয় অথবা রোগাপশমের প্রকৃত হেতু নির্দ্দেশ করিতে সক্ষম হইতে পারেন না। এমন কি, তিনি একজন প্রকৃত চিকিৎসক নামে অভিহিত হইবারও যোগ্য নহেন।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবাদী, বায়ু-পিত্ত-শ্লেষ্মা স্বীকার করেন না। কিন্তু পুরাণ-তন্ত্রের আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, যে, অতি প্রাচীনকালে ইউরোপীর চিকিৎসা-বিজ্ঞানেও বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মাই চিকিৎসার মূলতত্ত্ব রূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল, এবং তাহা এই আয়ুর্ব্বেদ হইতেই গৃহীত। কিন্তু আজকাল কোন কোন পাশ্চাত্য দেশবাসী তাহা স্বীকার করিতে লজ্জা বোধ করেন। তাঁহারা বলেন গ্রীকদেশ হইতেই ভারতবাসিগণ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা-তত্ত্ব সংগ্রহ করেন গ্রীকগণ ভারতবর্ষ হইতে গ্রহণ করে নাই। ইহা অতীব হাস্যজনক। আয়ুর্ব্বেদ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন চিকিৎসা বিজ্ঞান। যাহার অত্যুজ্জ্বল কিরণমালা ইতস্ততঃ বিস্তৃত হইয়া এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্দ্দিকে নানা দিক্‌দেশে ঘোরতর অমানিশার অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্ন মানবজাতির তমোরাশি বিধ্বংস করিয়াছিল, যাহার প্রভাবে নানাবিধ দুঃখ-যন্ত্রণাগ্রস্ত মানবকুল ব্যাধিমুক্ত হইয়া, সবল ও সুস্থ দেহে দীর্ঘজীবন লাভ পূর্ব্বক পরম সুখে কালাতিপাত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন,—এই সেই আয়ুর্ব্বেদই পৃথিবীস্থ অন্যান্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের জন্মভূমি! উপস্থিত সভ্য মহোদয়গণ! আপনারা অবগত আছেন, যে, ত্রিকালদর্শী মহর্ষিগণের বিশুদ্ধ জ্ঞান-প্রসূত এই আয়ুর্ব্বেদ কি ভাবে পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল, সুতরাং সেই সকল পুরাবৃত্তের পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিয়া আপনাদের বিরক্তি উৎপাদন করিব না। বায়ু-পিত্ত-শ্লেষ্মা তাহারই মূল স্তম্ভরূপে থাকিয়া আয়ুর্ব্বেদকে বিবিধ ঘূর্ণি-বায়ু, উল্কাপাত প্রভৃতি হইতে রক্ষা করিয়া আসিতেছে। এ কথা অবশ্যই বলা আবশ্যক, যে, পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহাদের চিকিৎসা-শাস্ত্রকে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা-শাস্ত্র বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহা নিতান্তই অবিজ্ঞান যে, অদ্যাপি তাঁহারা তাঁহাদের চিকিৎসা শাস্ত্রে এই বায়ু-পিত্ত-শ্লেষ্মা ত্রিধাতুকে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের মূলস্তম্ভরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই।

শারীর বায়ু কি? ইহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। বায়ু কি, জানিতে হইলে, জগতের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই একটী কথায় আলোচনা করা আবশ্যক। তাহা হইলে বুঝাইবার এবং বুঝিবার পক্ষে অনেকটা সুবিধা হইবে। আমি এক্ষণে প্রমাণ করিব, যে, কারণভূত জল, বায়ু, অগ্নিই মানবদেহে বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মা নামে অভিহিত হয়।

ঋষিগণ বলিয়াছেন যে, এই পরিদৃশ্যমান বিশাল ব্রহ্মাণ্ড পাঞ্চভৌতিক। ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ মরুৎ, ব্যোম, এই কয়েকটী পঞ্চ মহাভূতের

সমষ্টি মাত্র। পরম সূক্ষ্ম পরমাণু সকল বিভিন্নরূপে পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াই নানাবিধ বৈচিত্র্যময় জগতের সৃষ্টি করিতেছে। মানব-দেহ তাহারই একটী অংশমাত্র। সুতরাং ইহাও পাঞ্চভৌতিক, কিন্তু অপরাপর ভৌতিক দ্রব্যের সহিত বিসদৃশ। পঞ্চমহাভূত হইতে কিরূপে এই জগতের সৃষ্টি হইতেছে, তাহার আলোচনা করিলে, দেখা যাইবে, যে, পার্থিব পরমাণুই সমস্ত কার্য্য-দ্রব্যের আধার। অর্থাৎ কার্য্য-দ্রব্যগুলি পার্থিব পরমাণুতে প্রতিষ্ঠিত। জল দ্রব ও স্নিগ্ধ বলিয়া জলীয় পরমাণু ঐ সকল পার্থিব পরমাণুর সংযোজক। অগ্নি, বায়ু ও আকাশ—সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যারম্ভেই পূর্ব্বোক্ত পরমাণুতে সমবেত থাকিয়া কার্য্য দ্রব্যের সৃষ্টি করে। কার্য্য-দ্রব্যের ভেদ এই, বায়ু, অগ্নি ও আকাশ হইতেই উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ ঘট, পট নয়, অথবা ঘট হইতে পট ভিন্ন, এইরূপ প্রতীতি অগ্নি, বায়ু ও আকাশ হইতেই উৎপন্ন হইতেছে। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন সংযোগ ও পরিণাম প্রাপ্ত হইয়াই নানাবিধ বৈচিত্র্যময় জগতের সৃষ্টি হইতেছে। ভিন্ন ভিন্ন পরিণাম প্রাপ্ত হয় বলিয়াই এই পঞ্চ মহাভূত ইতর ভেদ বিশিষ্ট কার্য্য দ্রব্যে পৃথক্ স্বরূপ এবং সংজ্ঞায় অভিহিত হয়। যেমন একই অগ্নি, বাড়বানল, বিদ্যুৎ, অশনি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে ও স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করে, সেইরূপ দৈহিক সেই অগ্নির নামই পিত্ত, জলের নাম শ্লেষ্মা এবং বায়ুর নাম বায়ু। দৈহিক বায়ুর নাম ও বায়ু এবং কারণভূত বায়ুর নাম ও বায়ু, কিন্তু উভয়ের মধ্যে ভেদ আছে, তাহা ক্রমে প্রকাশিত হইবে।

বায়ু পিত্ত ও শ্লেষ্মাই দেহের মূল। পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে, পঞ্চ মহাভূতই এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের মূল কারণ এবং মানবগণ সেই জগতেরই একটা অংশ, সুতরাং মানব-গণের মূলও পঞ্চমহাভূতই হইতেছে, কিন্তু এস্থলে বায়ু-পিত্ত-শ্লেষ্মাকে মূল বলায় বিরোধ উপস্থিত হইতেছে। মীমাংসা এই যে, ভৌতিক জল বায়ু ও অগ্নিই বিভিন্ন পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া, দেহে বায়ু-পিত্ত-শ্লেষ্মা নামে অভিহিত হয় এবং তাহারাই শুক্রশোণিতে অবস্থিতি করিতেছে, এবং এই শুক্রশোণিত হইতেই মানবের উৎপত্তি হয় বলিয়া, বাত-পিত্ত-শ্লেষ্মা-কেই দেহের মূল করা হইয়াছে। ফলকথা, এই যে, পরমাণু ভেদে দেখিতে গেলে, পঞ্চ-মহাভূতকেই দেহের মূল বলা যাইতে পারে। কিন্তু ভিন্ন পরিণাম বশতঃ দেহের মূল শুক্র-শোণিত হইতে উৎপন্ন হইতেছে বলিয়া শুক্র শোণিতকেই দেহের মূল বলা হইয়াছে। এবং ভৌতিক জল-বায়ু-অগ্নিই বায়ু-পিত্ত-শ্লেষ্মারূপে অবস্থিত থাকিয়া এই দেহের বৃদ্ধিসাধন করিতেছে। সুতরাং বায়ু-পিত্ত-শ্লেষ্মাই দেহ বৃদ্ধির মূল এবং এই বায়ু-পিত্ত-শ্লেষ্মাই বিকৃত হইলে শরীর ধ্বংসমুখে পতিত হয়। সুতরাং বায়ু-পিত্ত-শ্লেষ্মাই দেহ-বিনাশের কারণ। উপরোক্ত সিদ্ধান্ত দ্বারা দেখা যাইতেছে, যে, বায়ু-পিত্ত-শ্লেষ্মা কেবল দেহোৎ-পত্তির কারণ নহে, কিন্তু স্থিতি এবং বিনাশের কারণ।

বায়ু-পিত্ত-শ্লেষ্মার নাম দোষ। কারণ বায়ু স্বাভাবিক গতি শক্তি দ্বারা তাপ ও শৈত্যকে সঞ্চালিত করিয়া, পার্থিব পরমাণুকে দূষিত করে এবং স্বয়ংও দূষিত হয়। পার্থিব অথবা আকাশীয় পরমাণুর সেরূপ কোন শক্তি না থাকায় তাহারা অপরকে দূষিত করিতে

পারেনা, এজন্যই বায়ু-পিত্ত-শ্লেষ্মার নাম দোষ, অপর ভূতদ্বয়ের নাম দোষ নহে। পিত্ত, শ্লেষ্মা জড়, ইহাদের গতি-শক্তি নাই, স্বয়ং এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে পারেনা। বায়ু সেরূপ নহে, তাহার গতি-শক্তি আছে, সুতরাং অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে পারে এবং অপরকেও চালাইয়া লইয়া যাইতে পারে, সুতরাং **বায়ুই অন্যান্য ভূতের নিয়ন্তা বা চালক**। বায়ুর এইরূপ গতি-শক্তি কোথা হইতে আসিল? অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে, যে, বায়ু রজোগুণ বহুল এবং রজোগুণের স্বভাব এই যে, তাহা অত্যন্ত চঞ্চল। এক স্থানে কখনই স্থির থাকিতে পারে না। সুতরাং বায়ুও এক স্থানে স্থির থাকিতে পারে না এবং ইহাই তাহার গতি শক্তি।

জীবদেহের সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিলে, একটী অতিশয় আশ্চর্য্য কৌশল দেখা যাইবে, যে, প্রাণীগণের জীবনীশক্তি বা বুদ্ধিবৃত্তি কোন একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ নাই, কিন্তু প্রাণী-শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে, অণুতে এবং পরমাণুতেও তাহার উপলব্ধি হয়। ধাতুবাহি এই বায়ুর কার্য্যকলাপ আলোচনা করিলেও তাহা প্রমাণিত হইবে। দেখা যায় যে, মানবদেহের যেখানে যে পরিমাণ রসরক্তাদির আবশ্যক, অসংখ্য বায়বীয় পরমাণু তাহা ইতস্ততঃ বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। আবার যেস্থানে রোগোৎপাদন করিতে হইবে, এই বায়বীয় পরমাণুই বিপথগামী না হইয়া, ঠিক সেই স্থানে ধাতুসকল বহন করিয়া, উপনীত হইতেছে। এই ধাতু-বহন-ক্রিয়া অতি সূক্ষ্ম পরমাণু ভেদে বিভাগ করিয়া দেখিলে মনে হইবে, যেন উহারা প্রত্যেকে এক একটী প্রাণী।

বায়ু সর্ব্বদেহ ব্যাপী। যদিও এই দেহের অভ্যন্তরে বায়ুর কতকগুলি বিশেষ স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে, কিন্তু সাধারণতঃ ইহা সর্ব্বদেহ ব্যাপী অর্থাৎ বায়ু অহরহ জীবের সর্ব্ব দেহেই বিচরণ করিতেছে। শুক্রশোণিতান্তর্গত সামান্য পরিমাণ বায়ু এই দেহে কিরূপে ব্যাপ্ত হইতে পারে?—এইরূপ প্রশ্ন হইলে দেখিতে হইবে, বায়ুর হ্রাস বৃদ্ধি কিরূপে হইয়া থাকে। দেখা যায় যে, বায়ু, শুক্রশোণিতের অতি ক্ষুদ্রতম বীজভাগে শক্তিরূপে অবস্থিত থাকিয়া ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। মানবের এই স্থূলদেহ যেমন অবিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থিত থাকিয়াই প্রতি নিয়ত ক্ষয় ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে,—সেইরূপ শুক্রশোণিতান্তর্গত সূক্ষ্মতম শক্তিরূপী বায়ুও দেহের সহিত অবিচ্ছিন্ন ভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিয়াই ক্ষয় বা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। এই বীজরূপী বায়ু ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতম হইলেও ইহার শক্তি অচিন্ত্যনীয়। ইহাই প্রাণীগণের প্রাণ, আবার ইহাই প্রলয় কালে বিশ্বসংহারী মহাকাল। এই বায়ু বিকৃত হইলেই বিকৃতাঙ্গ সন্তান প্রসূত হয়, আবার ইহারই সাম্যাবস্থায় অবিকৃত সন্তান প্রসব হইয়া থাকে। যিনি প্রবল শ্বাস রোগে আক্রান্ত হইয়া দিবারাত্রি অসীম যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন, যিনি বাতরোগে আক্রান্ত হইয়া উত্থান শক্তি রহিত হইয়াছেন, যে বীরপুরুষ এক মন, দেড় মন ভার অবলীলাক্রমে হস্তদ্বারা উত্তোলন পূর্ব্বক শিরে স্থাপন করিতে সমর্থ হইতেন, আবার যখন তিনিই তাঁহার স্বীয় হস্তও উঠাইতে অক্ষম হন এবং যিনি অসহনীয় বেদনায় দিন রাত্রি "হায়রে গেলামরে" বলিয়া কাতর-ক্রন্দনে গৃহবাসী—এমন কি প্রতিবাসীকে পর্য্যন্ত অস্থির করিয়া তুলেন, তিনিই

কিয়ৎপরিমাণে এই বায়ুর শক্তি অনুভব করিতে পারেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বায়ু ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সুতরাং দেখা উচিত যে, বায়ুর হ্রাস-বৃদ্ধি কিরূপে হয়। আহার বিহার হইতে যেমন অন্যান্য ধাতুর—রস রক্তাদির উৎপত্তি হইয়া থাকে, সেইরূপ আহার-বিহার হইতেই বায়ুর ও উৎপত্তি হয়। কষায় রস, কটুরস ও তিক্তরস দ্রব্য হইতেই সাধারণতঃ বায়ুর উৎপত্তি হয়। আবার বাহ্য-বায়ু হইতেও শরীর বহু পুষ্টিলাভ করে। গুণের আলোচনা করিয়া বাহ্য বায়ু হইতে শারীর-বায়ুর বৃদ্ধি প্রতিপন্ন করা যায় না। কারণ, শারীর বায়ু ও বাহ্যবায়ু সমান গুণ বিশিষ্ট নহে। বাহ্যবায়ু অশীতোষ্ণ এবং শারীর বায়ু বহু শীত-যুক্ত। সমান গুণ দ্রব্য দ্বারাই সমান গুণ দ্রব্যের বৃদ্ধিসাধন হয়, অসমান গুণ দ্রব্যদ্বারা হয় না। সুতরাং বহির্বায়ু দ্বারা শারীর-বায়ুর বৃদ্ধি হওয়া অসম্ভব। কিন্তু বায়ুর উৎপত্তি বিষয়ে আলোচনা করিলে, তাহা সপ্রমাণ হইতে পারে। উৎপত্তির আলোচনায় দেখা যায় যে, কারণ ভূত বায়ুর অংশ হইতেই শারীর বায়ু নির্ম্মিত। সুতরাং বাহ্যবায়ু হইতে শারীর-বায়ুর বৃদ্ধি বা পুষ্টি অবশ্যম্ভাবী। শ্বাস-ক্রিয়ার আলোচনায় ইহার সুস্পষ্ট মীমাংসা হইবে।

শারীর বায়ুর স্বরূপ কি? শারীর-বায়ুর কোনপ্রকার বর্ণ বা রূপ নাই। এবং নাই বলিয়াই উহা চক্ষুর অগোচর,—যেমন বাহ্যবায়ু। বাহ্যবায়ুরও কোনপ্রকার রূপ না থাকায় উহা দর্শনেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত নহে। ইন্দ্রিয়-গণের স্বভাব এই যে, স্বজাতীয় দ্বারা অভি-ব্যক্ত হইয়া বিষয়ের গ্রাহক হয়; যেমন মধু-রাদি রস, লালা দ্বারা অভিব্যক্ত হইলেই রস নেন্দ্রিয় তাহার গ্রাহক হয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত লালার সহিত সংমিশ্রিত না হইবে, ততক্ষণ কি রস,—তাহা রসনেন্দ্রিয় গ্রহণ করিতে পারে না। সেইপ্রকার রূপ বা বর্ণ আলোকের দ্বারা অভিব্যক্ত হইলেই চক্ষুরিন্দ্রিয় তাহা গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু বায়ুর কোনপ্রকার রূপ না থাকায়, উহা আলোকের দ্বারা অনভিব্যক্ত, সুতরাং চক্ষুর অগোচর। কিন্তু গতি-ক্রিয়া দ্বারা উহার সত্ত্বোপলব্ধি সুনিশ্চিত।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বায়ু রজোগুণময় এবং সূক্ষ্ম, সুতরাং গতিমান। এতদ্ভিন্ন পিত্ত, শ্লেষ্মার কোন গতি নাই। বায়ুই ইহাদিগকে চালিত করিয়া সর্ব্বদেহে আনয়ন করে। ঠিক্ যেমন বহির্জগতে একমাত্র বায়ুই জলীয় পরমাণু এবং আগ্নেয় পরমাণু বহন করিয়া এই বিশাল-ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছে।

কিরূপ দ্রব্য-সেবনে শারীরবায়ুর বৃদ্ধি হয়? এবং কেন হয়?—ইহার মীমাংসা করিতে হইলে, বায়ুর উৎপত্তি এবং তাহার গুণ বিষয়ে আলোচনা করা আবশ্যক। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, সমানগুণ দ্রব্য দ্বারাই সমান গুণ দ্রব্যের বৃদ্ধিসাধন স্বাভাবিক। যেমন রসের দ্বারা রসের, রক্তদ্বারা রক্তের, এবং মাংসদ্বারা মাংসের বৃদ্ধি হয়,—সুতরাং বায়ুর তৎসমানগুণ দ্রব্য কি, তাহাই অগ্রে দেখা আবশ্যক। শারীর-বায়ুর উৎপত্তি সম্বন্ধে ঋষি-গণ বলেন যে, "বায়্বাকাশাভ্যাং বায়ুঃ"। অর্থাৎ শারীর বায়ু=কারণভূত—বায়ু এবং আকাশাংশ হইতে উৎপন্ন। সুতরাং এই শারীর বায়ু ও কারণভূত বায়ু যে ঠিক্ একজিনিষ নহে, তাহা সুস্পষ্ট প্রতীত হইতেছে। এবং এই জন্যই শারীর বায়ু শীত এবং কারণ-বায়ু অশীতোষ্ণ। বিশিষ্ট পরিণতিই ইহার কারণ। শারীর

বায়ুর পরমাণুগুলি অসংবাত অর্থাৎ একে অন্যের সহিত মিলিত হয় না। পিত্ত, শ্লেষ্মার অবয়বগুলি সেরূপ নহে, সংবাত। সুতরাং বায়ু সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতম অবস্থায় অবস্থিতি করে। বায়ু সুদৃঢ় পাষাণকে ভেদ করিয়া, চলিয়া যাইতে পারে। ইহা দেহের অস্থি মাংস, নখ ও কেশাদিতে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহাদের বিকৃতি উৎপাদন করিতেছে।

বায়ুরগুণ—এই বায়বীয় পরমাণুগুলি রুক্ষ, লঘু, চল, বহু, শীঘ্র, শীত, পরুষ এবং বিশদ। এতদ্‌গুণ বিশিষ্ট দ্রব্য সেবনে বায়ুর বৃদ্ধি এবং বিপরীত গুণ দ্রব্যদ্বারা বায়ুর উপশম হইয়া থাকে।

একথা মনে করা উচিত নয় যে, রুক্ষ এবং উষ্ণ কটুরসের দ্বারা বায়ুর যখন বৃদ্ধি হইয়া থাকে, এবং শীত ও স্নিগ্ধ-মধুর রস দ্বারা যখন বায়ুর প্রশমন দেখা যায়, তখন বায়ু যে শীত, তাহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? সত্য বটে, শীত দ্রব্য দ্বারাও বায়ুর উপশম এবং উষ্ণ দ্রব্য দ্বারাও বায়ুর বৃদ্ধি দেখা যায়, কিন্তু তজ্জন্য বায়ু শীত নয় এরূপ বলা যায় না। কারণ বায়ু শীত হইলেও শীতত্ব প্রধান নয়, রুক্ষতাই প্রধান। কটুরস উষ্ণ হইলেও অতিশয় রুক্ষ, তদ্ভিন্ন লঘুতা, বৈশদ প্রভৃতি আরও কতকগুলি বায়ুর সমান জাতীয়গুণ বিদ্যমান থাকায় উষ্ণতার প্রভাবকে অভিভূত করিয়া বায়ু বৃদ্ধির হেতু হয়। কারণ ইহাতে বায়ু প্রশমক গুণ অপেক্ষা বাত বর্দ্ধক গুণই অধিক বিদ্যমান থাকে। আবার শীত-মধুর রসে, স্নিগ্ধতা, মধুরতা, গুরুতা এবং পিচ্ছিলতা প্রভৃতি বাত বিরুদ্ধগুণ অধিক থাকায় শৈত্যকে অভিভূত করিয়া বাত প্রশমনে সমর্থ হয়। সুতরাং বায়ুর শীতত্বে কোন সংশয় থাকিতে পারে না।

বায়ুর কার্য্য কি? শুক্র, শোণিত, মল, মূত্র এবং গর্ভের নিষ্ক্রামন প্রভৃতি বায়ুর কার্য্য। এতদ্ভিন্ন ধাত্বাদির বহন করা ও শ্বাস-প্রশ্বাস প্রভৃতিও বায়ুর কার্য্য। এই যে, গর্ভাশয়ে শুক্র, শোণিতের মিলন, ইহাও বায়ুর কার্য্য। স্ত্রী পুরুষের সহবাসে বায়ু উত্তেজিত হইয়া, শুক্র-শোণিতে যে বেগ উৎপাদন করে, তদ্বারা শুক্র-শোণিত স্বস্থানচ্যুত হইয়া, উভয়ে গর্ভাশয়ে মিলিত হয়। শুক্র-শোণিতের এই বেগের প্রতি অন্য কোন কারণ নাই। জীবিত শক্তি ও অদৃষ্ট প্রভৃতি অন্যতর হেতু হইলেও তাহারা অবেগব-দ্রব্যে গতি শক্তি প্রদান করিতে পারে না। পারিলে পিত্ত, শ্লেষ্মা প্রভৃতিও গতিমান্ হইত।

ইহা যেমন শুক্র-শোণিতকে মিলিত করে তেমনই শুক্র শোণিতে শক্তিরূপে অবস্থিত থাকিয়া, উহাদিগকে নানা আকৃতিতে বিভক্ত করে এবং উহাদের গঠন নির্ম্মাণ করে। ইহাদের কার্য্যগুলি আলোচনা করিলে, ইহাদিগকে কোনরূপ বুদ্ধিজীবি প্রাণী না বলিয়া থাকা যায় না। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে যাহা "সেল্" বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহা কি এই বায়ু মিশ্রিত ধাতব অণু? পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবাদীগণ বলেন যে "সেল্" গুলি বহুরূপী, ক্ষণে ক্ষণে উহারা আকৃতির পরিবর্ত্তন করে। "আয়ুর্ব্বেদে" ঠিক তদ্রূপ কথা না থাকিলেও ইহার অনুরূপ তত্ত্ব আছে। আয়ুর্ব্বেদে বলা হইয়াছে, যে, শুক্র শোণিতে বীজ রূপ সপ্ত ধাতুই বিদ্যমান আছে। এবং বায়ুই তাহাদিগকে ভাঙ্গিয়া বিভিন্ন আকারে পরিণত করে। আমার বোধ হয়, এই উভয় তত্ত্বেরই বিলক্ষণ সামঞ্জস্য আছে। যাহা হউক এ বিষয়ের অধিক আলোচনা করা অদ্যকার প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে।

বায়ুর প্রধান স্থান শ্রোণী প্রদেশ অর্থাৎ বায়ু সর্ব্বশরীর ব্যাপী হইলেও ইহাদিগকে শ্রোণী প্রদেশেই অধিক পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। পক্বাশয়গত কতকগুলি শোণিত-স্রোতে ইহারা বিশেষ ভাবে বিচরণ করে। তদ্ভিন্ন সমস্ত দেহেই ইহাদের গতি আছে। শিরা, ধমনী, স্রোত প্রভৃতি ইহাদের গমনমার্গ। ইহারা বিশেষ ভাবে অস্থিকে অবলম্বন করিয়া বাস করে। ব্যায়ামাদি দ্বারা বায়ুর বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়, কিন্তু তাহা স্থানচ্যুতিরূপ বৃদ্ধি মাত্র। অর্থাৎ ব্যায়ামাদি দ্বারা বায়ু প্রকুপিত হইয়া, অস্থি হইতে বহির্গত হইয়া সর্ব্বদেহে একটা প্রবল ঝটিকা উৎপাদন করে, আবার পরক্ষণেই তাহার শান্তি হয়। শ্রোণী প্রদেশ বায়ুর সর্ব্ব প্রধান স্থান হইলেও নাভি হৃদয়, কণ্ঠ ও সমস্ত সন্ধিতেই ইহারা বিশেষ ভাবে অবস্থিতি করে।

কি পরিমাণ বায়ু দেহে অবস্থিতি করে, তাহা বলা যায় না। রস-রক্তাদি ধাতু কি পরিমাণ থাকে, তাহা নিরূপিত আছে, কিন্তু বায়ু সম্বন্ধে সেরূপ কিছু নাই, হইতেও পারে না। কারণ-বায়ু অসংঘাত অর্থাৎ মিলিতাবয়ব নহে; এবং অসংঘাত বলিয়াই ইহাকে ধরাও যায় না। কিন্তু ঔষধ দ্বারা ইহার উপশম করা যায়। প্রকুপিত বায়ু, শরীরের যে অংশে থাকে, সেবিত ঔষধের বীর্য্য তথায় প্রবেশ করিলেই বায়ুর সহিত মিলিত হয়, এবং মিলিত হইলেই বিপরীত গুণদ্রব্য দ্বারা তাহার উপশম হয়। দৈহিক অন্যান্য রস-রক্তাদি ধাতুর গতি যেমন নিয়মিত অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট স্রোতের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়, বায়ুর গতির সেরূপ কোন বিশেষ নিয়ম নাই। যদি ও কতকগুলি বায়ু-স্রোত ও দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি তাহারা দেহের সকল স্রোতেই গমন করে এবং কখন বা রস-রক্তাদি স্রোতের অনুকূলে, কখন বা প্রতিকূলে গমন করিতে পারে।

বায়ুর দ্বারা দেহের ক্ষয় হইতেছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বায়ুর রুক্ষতাই প্রধান, এবং বায়ু রুক্ষ বলিয়াই অত্যন্ত শোষক। এই বায়ুই রসরক্তাদি ধাতু ও উপধাতু এবং তাহাদের মলাংশ শোষণ করিয়া বহির্মার্গে লইয়া যায়। লঙ্ঘিত ব্যক্তির বাতুক্ষয় এই প্রণালীতে সম্পন্ন হইয়া থাকে। শ্বাশ-ক্রিয়া দ্বারাও প্রতি নিয়ত দেহের ক্ষয় হইতেছে। এতদ্ভিন্ন পীড়িতাবস্থায় যে বহির্ম্মুখ-স্রোতঃ দ্বারা অতিরিক্ত ধাতুক্ষয় হইতে দেখা যায়, তাহাও বায়ুর কার্য্য। ইহা দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, দোষ-ধাতু-মল প্রভৃতির বহন করা এবং শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ ও পরিত্যাগ করা প্রভৃতিই বায়ুর প্রধান কার্য্য।

বস্তুত বায়ুর কোন ভেদ নাই, একই বায়ু সর্ব্বদেহে বিচরণ পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত কার্য্য সকল নির্ব্বাহ করিতেছে। কিন্তু কার্য্য ভেদে ঐ বায়ুকে প্রাণাদি সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়া, পাঁচ প্রকারে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যেমন প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান। ইহাদের মধ্যে অপান, ব্যান ও সমান বায়ু দোষ-ধাতু-মল প্রভৃতির বহন করে। এবং প্রাণ ও উদান—ইহারা শ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়ায় বিশেষ ভাবে নিযুক্ত। বায়ু প্রধান রূপে এই শ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়া দ্বারাই প্রাণীগণকে জীবিত রাখে। ইতিপূর্ব্বে দোষ-ধাতু-মলাদির সঞ্চালন ক্রিয়া বলা হইয়াছে, অধুনা শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্বারা কি ভাবে বায়ু প্রাণীগণকে সঞ্জীবিত রাখে, তাহা

সংক্ষেপে বর্ণন করিয়া, এই বায়ু প্রবন্ধের শেষ করিব।

শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রধান স্থান ফুস্‌ফুস্‌। যদিও ফুস্‌ফুসের বর্ণনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, তথাপি ফুস্‌ফুস্‌ সম্বন্ধে দুই একটী কথা না বলিলে বিষয়টী সুস্পষ্ট প্রতীত হইবে না। সুতরাং এ সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক।

মানবজাতির ফুসফুসের আকৃতি কোবিদার (কাচনার) পত্র সদৃশ দুই ভাগে বিভক্ত। কণ্ঠ দেশ হইতে শ্বাস-নাড়ী নির্গত হইয়া, দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া, ফুসফুসের বাম-দক্ষিণ—দুই অংশে প্রবেশ করিয়াছে। এবং অবশেষে ইহা অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া, সর্ব্বশেষে প্রত্যেকটী শাখা এক একটী ক্ষুদ্র কোটরে পরিণত হইয়াছে। পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানে ফুস্‌ফুস্‌কে একটী স্পঞ্জের ন্যায় বলা হইয়াছে। আমার বোধ হয়, স্পঞ্জের ন্যায় বলিলে উহার বর্ণনা সম্পূর্ণ হয় না। ফুস্‌ফুস্‌কে সমুদ্রফেণের সহিতও কেহ কেহ তুলনা করিয়াছেন। সমুদ্র ফেণের বর্ণ ও ফুস্‌ফুসের বর্ণে সৌসাদৃশ্য আছে, এবং সমুদ্রফেণের উপরিভাগ যেমন নির্ম্মল ও অভ্যন্তর ভাগ সচ্ছিদ্র, ফুস্‌ফুস্‌ও ঠিক তদ্রূপ। স্পঞ্জ সচ্ছিদ্রতায় ফুস্‌ফুস্‌ তুল্য হইলেও অন্যান্য বিষয়ে সামঞ্জস্য নাই। যাহা হউক বুঝিতে হইবে, যে, ফুস্‌ফুস্‌ কোবিদার পত্র সদৃশ দ্বিধাবিভক্ত হইয়াও ঠিক সমুদ্রফেণের ন্যায়। এই সকল ছিদ্র মধ্যে সমল-শোণিতের সহিত উদান-বায়ু বাস করে। ঊর্দ্ধগমনশীল বায়ুর নামই উদান-বায়ু। প্রাণবায়ু ফুস্‌ফুসে প্রবেশ করিয়া শোণিত মধ্যে আকাশীয় অংশ এবং কিয়ৎ পরিমাণ বিশুদ্ধ বায়বীয় অংশ প্রদান করে। উদান বায়ু তৎক্ষণাৎ শোণিতের মলভাগ লইয়া বহির্গত হয়। এইরূপ আদান-প্রদানের নামই শ্বাস-প্রশ্বাস। বায়ু স্বয়ং অরূপ, তাহার কোন বর্ণই নাই। কিন্তু ইহার সংযোগে এক প্রকার লাল বর্ণ হইতে দেখা যায়। তবে ইহার সংযোগে রস রঞ্জিত হইয়া শোণিত রূপে পরিণত হয় কি না, তাহার আলোচনা করা, এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, সুতরাং সে বিষয়ে কোন কথা বলা হইল না।

উদান বায়ুর প্রধান স্থান ফুস্‌ফুস্‌। উদান-বায়ু এই স্থান হইতে নির্গত হইয়া যায় বটে, কিন্তু একেবারে নিঃশেষ হয় না। দেখা যায় যে, উদান বায়ু উপযুক্তরূপে বহির্গত হওয়ার পরও আমরা ইচ্ছা করিয়া আরও কতকটা নিঃসরণ করিতে পারি।

প্রাণ বায়ুর প্রধান স্থান মস্তক। কারণ প্রাণবায়ুর কতকাংশ মস্তকে থাকিয়া যায়। অথবা উভয়েরই প্রধান স্থান উরঃ। প্রাণ বায়ুর গতি ফুস্‌ফুস্‌ পর্য্যন্ত; ইহার অধিক নয়। প্রাণবায়ু ফুস্‌ফুস্‌ হইতে শোণিতে প্রবেশ পূর্ব্বক সমস্ত দৈহিক ক্রিয়া সম্পাদন করিতেছে। এই প্রাণ-বায়ুকে আমরা চেষ্টা করিয়া কিছুক্ষণ বদ্ধ রাখিতে পারি সত্য, কিন্তু চিরদিনের জন্য বা কিছুদিনের জন্যও বদ্ধ রাখিতে পারি না। সেরূপ বদ্ধ রাখিবার জন্য চেষ্টা করিলে ইহা একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। কেহ যদি সৈন্ধ-রাশ্ব (উচ্চৈশ্রবাঃ) কে বাঁধিয়া রাখে, তবে সে যেমন খুঁটি উঠাইয়া, বৃক্ষাদি উন্মূলিত করিয়া, প্রস্থান করে, এই প্রাণ-বায়ু ও সেইরূপ বাঁধা পড়িলে আর রক্ষা নাই, একেবারে

প্রলয়মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক সমস্ত বায়ু সঙ্গে করিয়া এই দেহ-ব্যূহ ভেদ করিবেই করিবে। তখন তাহার সেই গতিরোধ করিতে পারে, এখন ভগবানও নাই। বলিতে কি,—সেই মুহূর্ত্তেই মানব সর্ব্বপ্রকার ঐহিক সুখদুঃখ, কলহ, বিচার এবং শত্রুতা-মিত্রতা—সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভবলীলা সংবরণ করে।

বায়ুর প্রকৃতি-বিকৃতি ও তাহার বিস্তৃত কার্য্যের অলোচনা করিয়া আর আপনাদের সময় নষ্ট করিব না। *

কবিরাজ শ্রীহরমোহন মজুমদার।

* এই প্রবন্ধ গত ১৩২৩ সালের ২১শে চৈত্র "আয়ুর্ব্বেদ সভা"র ১ম সাধারণ অধিবেশনে কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয়ের সভাপতিত্বে পঠিত হইয়াছিল।

"আয়ুর্ব্বেদে"র কষায় মাহাত্ম্য।

—:*:—

গত চৈত্রমাসের ৭ম সংখ্যক "আয়ুর্ব্বেদে" শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় বি, এ, বি, এল, মহাশয়ের লিখিত একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। যাহাকে লিপি-কৌশল বলে, সুরেন্দ্রবাবুর লেখায় তাহা বহুল পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে। একবার পড়িলে, আর একবার পড়িতে ইচ্ছা করে; এরূপ লেখা কচিৎ-কদাচিৎ প্রকাশিত হয়। রায় মহাশয়ের লেখা সুখোস্থ, অক্রুর, বিস্পষ্টার্থ এবং মনোহর। তজ্জন্য বার বার পড়িতে প্রবৃত্তি জন্মে, পড়িয়া বন্ধুজনকে শুনাইতেও ইচ্ছা করে।

লেখকের শ্যালিকা দুরারোগ্য কাস-জ্বর-রক্তপিত্ত রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। ডাক্তারি চিকিৎসার আশ্রয় লইয়া এবং ডাক্তারদিগের উপদেশ অনুসারে স্থানে-স্থানে ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া, তাঁহাকে আরোগ্য-দান করিতে সমর্থ হন নাই। তারপর সুরেন্দ্র বাবুর প্রতিবেশ-বাসি বন্ধু জনের কথানুসারে (বোধ হয় তাঁহারা Uneducated) এবং তাঁহার স্ত্রীর আগ্রহাতিশয্যে অগত্যা কবিরাজি চিকিৎসা করাইছে, রোগিণী আরোগ্য লাভ করেন।

সুরেন্দ্র বাবু লোক-হিতৈষণার বশবর্ত্তী হইয়া, পীড়ার অহেতুক-সংক্ষিপ্ত লক্ষণ এবং যে কষায় পান করিয়া রোগিণী রোগের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন, তাহা জনসাধারণকে জানাইবার জন্য সরল প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার রচিত প্রবন্ধ সাদরে "আয়ুর্ব্বেদে" মুদ্রিত এবং প্রচারিত হইয়াছে। যে কেহ পাচনের পত্রী দেখিয়া প্রশস্ত দ্রব্য যোগে পাচনটী তৈয়ার করিয়া, তথা কথিত রোগে ব্যবহার করিবেন, তিনিই পরমোপকার লাভ করিবেন,—ইহাই প্রবন্ধ রচনায় মুখ্যোদ্দেশ্য। আর একটা গৌণ উদ্দেশ্যও আছে। রায় মহাশয় কৌশলে অনাগত রোগ প্রতিষেধেরও যৎকিঞ্চিৎ ব্যবস্থা দিয়াছেন। আমরা সে কথাটা একটু বিস্তার করিয়া বলিতেছি।

যাদৃশ শিক্ষার গুণে নর-নারীগণ আত্মহিতে রত রহিয়া, পরহিত পরায়ন হইয়া, সুস্থশরীরে এবং প্রসন্নমনে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ

করিতে পারেন এবং পরকালে তাঁহারা সদ্গতি লাভ করিতে সমর্থ হন, তাদৃশ ঐহিকামুষ্মিক হিতকারী শিক্ষার নাম সুশিক্ষা। কেবল পড়িলে-শুনিলেই শিক্ষার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। শ্রুত এবং অধীত সদুপদেশানুসারে চলিতে শিখিলে শিক্ষার সাফল্য ঘটে। বর্ত্তমানকালে বিদ্যার্থি-বালকবালিকারা নানা সদুপদেশ পূর্ণ গ্রন্থ পাঠ করিয়া থাকেন এবং শিক্ষকের মুখে, ও অন্যসূত্রে বহু সদুপদেশ শ্রবণ করিতেছেন। কিন্তু অধীত এবং শ্রুত উপদেশ অনুসারে কর্ম্মে অভ্যস্ত হইতে অনেকে বাধ্য নহেন। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যা ত্যাগের সুফল (Advantage of early rising) বহুজনের জানা-শুনা আছে; কিন্তু কেহ ৭টায়, কেহ বা ৮টায়, কেহ কেহ তার চেয়েও বেশী বেলায় শয্যাত্যাগ করেন। এ একটা দৃষ্টান্ত মাত্র। পুষ্টিজনক, তুষ্টিবর্দ্ধক, আয়ুষ্য এবং যশস্য বহু সদ্বৃত্ত জানিয়া শুনিয়াও লঙ্ঘন করিতে অনেকে ইতস্ততঃ করেন না। কারণ অধুনা সদাচরণে বাধ্য করিবার কেহই নাই। শিক্ষকেরা উপদেশ দিয়াই কর্ত্তব্য কর্ম্ম শেষ করেন, গুরুজনেরা অগত্যা সে কাজে একান্ত উদাসীন; সমাজের হাত হইতে শাসনদণ্ড স্খলিত-প্রায়। লোক মাত্রেই দণ্ডজিত; স্বভাব শুচি মনুষ্য একান্ত দুর্লভ। দণ্ড-ভয়-ভীত নর-নারীগণ নিয়মিত রহিয়া ঐহিক ভোগ-সুখ উপভোগ করিতে সমর্থ হন। দণ্ডের ভয় নাই; যার যেমন ইচ্ছা সে সেই ভাবেই চলে। বিলাস-বাসনা চরিতার্থ করিতে অনেকেই প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। তজ্জন্য তাঁহাদিগকে অনেক সদ্বৃত্ত লঙ্ঘন করিতে হয়। হিতায়ুর প্রতিকূল অনুচিত আহার, বিহার, ব্যায়াম, বিশ্রাম, শয়ন, উত্থান প্রভৃতিতে আশক্ত হইয়া শারীর-মানস-স্বাস্থ্য হারাইয়া তাঁহাদিগকে আয়ুষ্কাল কাটাইতে হয়। এই সকল কথা সংক্ষেপে বুঝাইবার জন্য সুরেন্দ্র বাবু একখানি সজীব চিত্রপট অঙ্কন করিয়াছেন। শ্রম-বিমুখতা, অকাল নিদ্রা, অতিনিদ্রা, দেশ কালের অনুপযোগী পরিচ্ছদ ধারণ এবং অপ্রসন্ন-চিত্ততা প্রভৃতি ভাবগুলি সে পট খানিতে বেশ প্রস্ফুটিত হইয়াছে। সুরেন্দ্র বাবু আর একখানি চিত্রে লক্ষ্মীদেবীর মূর্ত্তি আঁকিয়া দিয়াছেন। সে চিত্র খানির ভাব গ্রহণ করিতে হইলে, অতীতের এবং বর্ত্তমানের সুসমাবেশ হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক। তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি।

কিছুকাল পূর্ব্বে এদেশের স্ত্রীলোকেরা বিদ্যালয়ে লেখা পড়া শিখিতেন না। কিন্তু তখন স্বতন্ত্র প্রকার স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলন ছিল। সে সময়ে পুরাণ ও ইতিহাস শুনিবার নানা প্রকার উপায় ছিল। পুরাণে উক্ত, সংহিতায় কথিত বিধি পালন এবং নিষেধ পরিবর্জ্জন করাইবার জন্য ব্রাহ্মণ-শাসন-দণ্ড পরিচালিত হইত। গুরুজনেরাও স্ব স্ব পরিজনবর্গকে সদাচারে নিয়মিত করিতে প্রয়াস পাইতেন। তদ্বিষয়ে সামাজিক শাসনও দৃঢ়তর ছিল। এই সকল কারণে স্ত্রীজনেরা লেখাপড়া না শিখিয়াও সদুপদিষ্ট হইতেন এবং অনেকে সদাচার পালন করিতে বাধ্য থাকিতেন। যদিচ বর্ত্তমানে হিন্দুসমাজের বন্ধন ছেদ করিবার জন্য নানা দিক দিয়া প্রবল আঘাত, বাঁধন রাখিবার জন্য দুর্ব্বল-প্রতিঘাত চলিতেছে; তথাপি বহুকালের অভ্যস্ত অনেকগুলি সদ্বৃত্ত আজিও সম্যক্ লোপ পায় নাই। তজ্জন্য এখনও আমরা পতি-রতা, ব্রত-নিয়ম পরায়ণা, গুরুজনে ভক্তিমতী, গৃহ কর্ম্ম নিপুণা, আলস্য রহিতা, আশ্রিত জনে দয়াবতী, প্রিয়-

বাদিনী এবং সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যা আর্য্য-ললনায় কচিৎ সাক্ষাৎ পাই। তাঁহারা সন্তান-পালনে আপনাদের অঙ্গবিশেষের সৌষ্ঠব হানি করিতে কুণ্ঠিত নহেন; আর্ত্তজনের সেবায় হাতে ব্যথা পাইবারও ভয় করেন না।

অধুনা কদাচিৎ মণি-কাঞ্চনের যোগ হইতেও দেখা যায়। পুরুষ পরম্পরাগত সদ্বৃত্তে নিরতা পরন্তু আধুনিক রুচির শিল্প-কলায় সিদ্ধ হস্তা হিন্দু রমণী আজিও সমাজে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহাদের বলয়মণ্ডিত কোমল হস্তের প্রযত্নে পতিদেবতার গৃহখানি লক্ষ্মীর আবাস ক্ষেত্র হইয়া উঠে, গৃহ প্রাঙ্গণ নন্দনকাননের শ্রী ধারণ করে। সুরেন্দ্র বাবুর অঙ্কিত দ্বিতীয় চিত্রপটে তথাবিধ স্ত্রী-মূর্ত্তির প্রতিকৃতি প্রকটিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য সেখানি তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গিনী পত্নীর প্রতিকৃতি।

প্রতিকৃতি দেখিয়া প্রাকৃতের ভাব অনুভব করা যাইতে পারে। যাঁহারা সুরেন্দ্র বাবুর কবিকৌশলের প্রতি মনঃসংযোগ করিবেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, তাঁহার মনোবৃত্যানুসারিনী মনোরমা—গৃহলক্ষ্মীর হৃদয়ে চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি সম্যকস্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছে, পরোপচিকীর্ষা বৃত্তিও পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। তিনি আলস্য পরিহীনা। এ সকল গুণ যাঁহার থাকে, তাঁহার আত্মা, মনঃ এবং ইন্দ্রিয়গণ সুপ্রসন্ন। প্রসন্নেন্দ্রিয় মনস্কতা স্বাস্থ্যের লক্ষণ। ভরসা করি, তিনি নিশ্চয়ই স্বাস্থ্যভ্রষ্ট নহেন। তাঁহার কর্ম্মেন্দ্রিয়, বৃত্তির অনুরূপ সাধনা করিতে আলস্য পরিহীন এবং সুনিপুণ। বাধা না মানিয়া, আপনার অনিষ্টাশঙ্কায় শঙ্কিত না হইয়া, তিনি রোগিণীর মস্তক আপনার অঙ্কে ধারণ করেন, তাঁহার হস্ত রোগি-পরিচর্য্যায় নিরালস্যে সঞ্চালিত হইতে থাকে।

সুরেন্দ্র বাবুর লিখিত প্রবন্ধ-বিশ্লেষণ করিয়া আরও অনেক কথা লেখা যাইতে পারে। কিন্তু কাগজের দাম অসঙ্গত চড়িয়া গিয়াছে, ছাপার এবং কালীর মূল্যও বাড়িয়া গিয়াছে। তজ্জন্য আর অধিক লিখিলাম না। "আয়ুর্ব্বেদে"র পাঠিকাগণ দুইখানি চিত্রপটের প্রতি মনঃ সংযোগ করিয়া, ভালমন্দ বিচার করতঃ আপনারা সদ্বৃত্ত-পরায়ণা হইবেন। আর পাঠকগণ আপন আপন গৃহিনীগণকে ভক্তিবিধি শিখাইবার প্রয়াস পাইবেন, ইহাই অকিঞ্চনের সবিনয় প্রার্থনা।

অতঃপর আমরা প্রস্তুত বিষয়ের অনুসরণ করিব। বলাবাহুল্য যে, আয়ুর্ব্বেদের কষায়-মাহাত্ম্য কীর্ত্তনই এই প্রবন্ধের প্রস্তুত বিষয়।

যে পানীয় ঔষধ এ দেশে পাচন নামে পরিচিত, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে তাহাকে কষায় বলে। শৃত, ক্বাথ এবং নির্য্যূহ,—কষায়ের অপর তিনটী নাম। কষায়ের আর একটী ব্যাপক অর্থ আছে, সে কথা পরে বলিব। আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ জ্বরাদি বিবিধ রোগে, নানা প্রকার কষায় কল্পনা করিয়া, প্রতি রোগের বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বিশেষ বিশেষ কষায় প্রয়োগ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। সে সকল কষায় বহুসংখ্যক,—কেহ গণিয়া দেখেন নাই কত? প্রতি রোগে বর্ণিত সমস্ত কষায় প্রয়োগ করিয়া, তৎসমুদায়ের ফলোপধায়কতা অবধারণ করা কোন চিকিৎসকেরই সাধ্যায়ত্ত নহে। অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণের মধ্যে যিনি যে যে রোগে যে যে কষায় প্রয়োগ করিয়া, বহুস্থলে সুফল লাভ

করিয়া আসিতেছেন, তাহা যদি লোক-হিতার্থে "আয়ুর্ব্বেদে" প্রকাশ করেন, তাহাহইলে, কালে "আয়ুর্ব্বেদের কষায় মাহাত্ম্য" প্রকরণটী পূর্ণাঙ্গতা প্রাপ্ত হইতে পারে। চুয়াল্লিশ বৎসরের অভিজ্ঞতায়, বহুস্থলে বহুবার প্রয়োগ করিয়া, আমি যে যে কষায়ের সুফলতা উপলব্ধি করিয়াছি, তাহা ক্রমশঃ এই প্রকরণে প্রকাশ করিব। প্রকরণটী যাহাতে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়, তদ্বিষয়ে বিজ্ঞ এবং অভিজ্ঞতর চিকিৎসকগণ মনঃসংযোগ করিলে, "আয়ুর্ব্বেদে"র কষায়" মাহাত্ম্য" বহু জনের বোধগম্য হইতে পারে।

সহচরাদি কষায়।*

আয়ুর্ব্বেদ-ভাণ্ডারের ঔষধ-রত্ন বহু সংখ্যক। সেই অনন্তকল্প রত্ন সমুচ্চয় গণিয়া শেষ করা অনায়াস সাধ্য-নহে। কেহ বলিতে পারে না—আয়ুর্ব্বেদের ভৈষজ্য-রত্ন সংখ্যায় কত, প্রকার-ভেদেই বা কত প্রকার। উপযুক্ত জহুরির অভাবে অধুনা সকল রত্ন চিনিবার উপায় নাই। সাজাইয়া-গুছাইয়া রাখিবার লোকাভাবে রত্ন সমুচ্চয় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে, কতক বা হারাইয়া গিয়াছে। কোন কোন রত্ন কাহার-কাহার গৃহে লুকান রহিয়াছে ; হয় ত তাঁহারা নিজস্ব করিয়া লইয়া ব্যবহার করেন, পরকে দেন না। দিবার উপযোগী উদারতা তাঁহাদের নাই।

এক সময়ে একজন বড় রকমের জহুরি অনেকগুলি ভৈষজ্যরত্ন নানা স্থান হইতে আহরণ করিয়া সাজাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন। সে অনেক দিনের কথা। জহুরির নাম চক্রপাণিদত্ত ; যে কোষে তাঁহার সংগৃহীত রত্ন ন্যস্ত রহিয়াছে, তাহার চলিত নাম "চক্রদত্ত সংগ্রহ।"

অলঙ্কার ত্যাগ করিয়া, কথাগুলি সংক্ষেপে বলিতেছি।

চক্রপাণিদত্ত নানা আয়ুর্ব্বেদে বিখ্যাত বহু সদ্‌যোগ আহরণ পূর্ব্বক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। সমস্ত সদ্‌যোগই সুফলপ্রদ। তজ্জন্য চক্রপাণিদত্ত কৃত সংগ্রহ আধুনিক বৈদ্যক মতাবলম্বি-চিকিৎসকগণের শ্রেষ্ঠ উপজীব্য গ্রন্থ। গ্রন্থ-প্রারম্ভে গ্রন্থকার বলিয়াছেন,—গূঢ়-বাক্য-বোধক বাক্যবান্ গ্রন্থ নিবন্ধন করিব। কিন্তু তিনি সর্ব্বত্র প্রতিশ্রুতির অনুরূপ কাজ করেন নাই। অনেক কথাই গূঢ়ার্থক রহিয়া গিয়াছে। সেব্যমান ঔষধ স্বকীয় গুণ-বীর্য্য-প্রভাবানুসারে শরীরের কোন দোষের, কোন ভাবের বৈগুণ্য কিরূপে দূর করিয়া, আরোগ্য বিধান করে, গ্রন্থকার কুত্রাপি তাহা স্পষ্টতঃ বলেন নাই। টীকাকারেরাও তদ্বিষয়ে একান্ত উদাসীন রহিয়াছেন।

একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। সূতিকা রোগাধিকারে "সহচরাদি কষায়ে"র ফলশ্রুতি—"সদ্যো জ্বর-সূতিকারোগহরম্"। কথাটা বিস্পষ্টার্থক নহে। বুঝিলাম, "সহচরাদি কষায়" জ্বরঘ্ন এবং সূতিকারোগ নাশক। সূতিকা রোগাধিকারে কষায়টী লিখিত হইয়াছে, তজ্জন্য কষায়টী যে সূতিকা জ্বরে হিতকর, তাহাও বুঝা গেল। কিন্তু সূতিকার সর্ব্বপ্রকার জ্বরে হিতকর অথবা জ্বর-বিশেষে হিতকর

* সংগ্রহকার কষায়ের কোন নাম দেন নাই। প্রায়শঃ আদ্যদ্রব্যের নামানুসারে কষায়ের এবং অন্য অনেক যোগের নামকরণ করা হয়। সহচর, আদ্য দ্রব্য বলিয়া যোগটীর নাম দেওয়া হইল, "সহচরাদি কষায়।"

তাহা বুঝা গেল না। স্থতিকা-রোগ-হর বলিলেই বা কি বুঝিব? প্রসবান্তে স্থতিকার শরীরে জ্বর, অজীর্ণ, অতীসার, গ্রহণী, আক্ষেপক এবং উন্মাদ প্রভৃতি নানা রোগ প্রকাশ পাইতে পারে। নবপ্রসূতার শরীরে যে রোগের আবির্ভাব হয়, তাহার পূর্ব্বে স্থতিকাশব্দ বসাইয়া রোগের নাম করণের প্রথা পূর্ব্বাপর প্রচলিত আছে, যেমন স্থতিকাজ্বর, স্থতিকা-গ্রহণী ইত্যাদি। এখানে "স্থতিকারোগ হর" —ইহার অর্থ কি বুঝিতে হইবে? যাবতীয় স্থতিকা-রোগয় বুঝিব? অথবা বিশেষ-বিশেষ স্থতিকা-রোগ নাশক বুঝিতে হইবে? স্থতিকা-রোগ স্থতিনীর সর্ব্বরোগবাচী হইলে, জ্বর কথাটা পৃথক্ করিয়া বলা হইল কেন?

এইরূপ সন্দিগ্ধার্থের মীমাংসা আবশ্যক। স্থতিকা রোগ বলিলে, অধুনা প্রসূতির অজীর্ণ, অতীসার এবং গ্রহণী রোগের অন্যতম রোগ,—সকলে বুঝিয়া থাকেন। সম্ভবতঃ চক্রদত্তের সময়েও স্থতিকারোগের তাদৃশ ব্যাপ্য অর্থও প্রচলিত ছিল। তাহা হইলে শ্লোকাংশের অর্থ করা যায়—স্থতিনীর জ্বর এবং অজীর্ণাদি রোগ নাশক অথবা জ্বর সংযুক্ত স্থতিকারোগ নিবারক।

বস্তুতঃ নবপ্রসূতার জ্বর সংযুক্ত উদরাময় রোগে "সহচরাদি কষায়" প্রয়োগ করিলে সুফল লাভ করা যায়।

সহচরাদি কষায়,—যথা,—

"সহচর পুষ্কর বেতসমূলং,
বিকঙ্কতং দারু কুলথ সমম্।
জলমত্র সৈন্ধব হিঙ্গুযুতং
সদ্যো জ্বর স্থতিকা রোগ হরম্"।

কষায়ের পত্রী ;—

সহচরমূল	...	২৭ রতি।
পুষ্করমূল	...	২৭ রতি।
বেতসমূল	...	২৭ রতি।
বিকঙ্কতমূল	...	২৭ রতি।
দেবদারু	...	২৭ রতি।
কুলথ কলায়	...	২৭ রতি।

ছয়খানি দ্রব্যযোগে উক্ত যোগ পরিকল্পিত হইয়াছে। সমবেত দ্রব্য ছয়খানির পরিমাণ ২ ভরি অর্থাৎ ১৬০ রতি গ্রহণ করিতে হয়। প্রত্যেক দ্রব্যের পরিমাণ ১৬০/৬ রতি। ১৬০ রতিকে ৬ ভাগ করিলে, প্রত্যেক দ্রব্যের পরিমাণ হয়—২৬⅔ রতি। ⅓ রতি ভগ্নাংশ অধিক লইয়া উক্তযোগে প্রত্যেক দ্রব্য ২৭ রতি মাত্রায় দেওয়া হইয়া থাকে।

কষায় পরিকল্পনা কালে সহচরাদি প্রত্যেক দ্রব্য একে একে ওজন করিয়া লইয়া, একসঙ্গে উত্তমরূপে কুটিয়া লইবে। তারপর মেটে পাত্রে কাঠের জ্বালে আধ সের জল সহ পাক করিবে। আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া, তাহাতে ৩ রতি শোধন-করা হিং এবং ৵০ দুই আনা সৈন্ধব চূর্ণ—গুলিয়া পান করিতে দিবে।

সহচরাদি কষায়ের দ্রব্য পরিচয়,—

সহচর—চলিত নাম ঝিণ্টী, ঝাঁটী, ঝিঁটী এবং ঝিটকী প্রভৃতি। ইহা এক প্রকার কণ্টকাকীর্ণ ক্ষুপজাতীয় উদ্ভিদ্। সচরাচর মূল দেশ হইতে একটী দণ্ড বাহির হইয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা বিস্তার করিয়া, বাড়িয়া উঠে। কুত্রাপি মূল হইতে একাধিক দণ্ড বাহির হইয়া ঝাড় বাঁধিয়া জন্মে। উর্ব্বর ভূমি জাত ঝিণ্টীর গাছ ৩।৪ হাত উচ্চ হয়। ইহার কাঁপে কাঁপে পত্র-গ্রন্থি। পত্রগ্রন্থি

বেড়িয়া তীক্ষাগ্র কাঁটা বাহির হয়। ঝিন্টীর মূল ঔষধার্থে ব্যবহার্য্য। অভাবে মূল কাণ্ড-দণ্ড-শাখা-পল্লব-সমেত ঝিন্টীর গাছ অনেকে ব্যবহার করেন। কিন্তু তাহা প্রশস্ত নহে। ঝিন্টী শুকাইলে গুণ-বীর্য্য-প্রভাবহীন হইয়া যায়। তজ্জন্য ঔষধের কাজে কাঁচা ঝিন্টী ব্যবহার করিতে হয়।

পুষ্করমূল—অধুনা পুষ্কর মূল পাওয়া যায় না। অভাবে কুড় ব্যবহৃত হয়। গন্ধ-বর্ণ-রসযুক্ত কুড় ব্যবহার করিতে হয়।

বেতসমূল—দুই প্রকার উদ্ভিদ বেতস নামে পরিচিত। এক প্রকার ক্ষীরীবৃক্ষ, অম্লবেতস নামে প্রসিদ্ধ। আর এক প্রকার বহু কণ্টকাকীর্ণ লতা-বিশেষ বেত নামে প্রসিদ্ধ। ইহার মূল "সহচরাদি" কষায়ে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বিকঙ্কত—বৈথর, বৈঁচি, বৈঁছী, বুঁজ এবং ডুমকুর প্রভৃতি নামে পরিচিত। বিকঙ্কত স্থূল-তীক্ষাগ্র কণ্টকাকীর্ণ উদ্ভিদ্। ইহার কাঁচা ফল সবুজ বর্ণ, পচ্যমান ফলের বর্ণ লাল। ফল পাকিলে স্নিগ্ধ-কৃষ্ণ-শ্রী ধারণ করে। ক্ষুদ্র গোলাকার ফলের মধ্যে পেয়ারা বীজের ন্যায় বহু বীজ নিহিত থাকে। বালকেরা সাদরে ইহার পাকা ফল খাইয়া থাকে। পক্ব-ফলের আস্বাদ কষায়-মধুর। পাকা ফল মালা গাঁথিয়া অঙ্গাভরণও করে। এই গাছের মূল বা স্থূল শিকড়ের ছাল অথবা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিকড় কষায়-কল্পনার জন্য ব্যবহার করিতে হয়।

দেবদারু—পার্ব্বতীয় বৃক্ষ বিশেষ। ইহার সুস্নিগ্ধ পীত-লোহিতাভ কাষ্ঠ ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়। বাঙ্গলা দেশে দেবদারু জাতীয় এক প্রকার গাছ জন্মে, তাহা ঔষধের জন্য ব্যবহৃত হয় না।

কুলত্থ—পাণ্ডুবর্ণ, চেপ্টা কলায় বিশেষ। বিবর্ণ হইলে ঔষধের কাজে ব্যবহার করা অনুচিত।

বিকঙ্কত কষায়।

সূতিকা রোগের অর্থাৎ প্রসূতির অজীর্ণ ভেদ সংগ্রহণ যোগ্য অতীসার এবং গ্রহণী রোগের শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

আমাদের দেশে মুষ্টিযোগ বা টোট্‌কা ঔষধ নামে অনেক ঔষধ অনেকের জানা আছে। যাঁহারা চিকিৎসক নহেন, তাঁহাদের মধ্যেও কেহ কেহ মুষ্টিযোগ-বিশেষ প্রয়োগ করিয়া, অত্যাশ্চর্য্য সুফল দেখাইয়া থাকেন। চিকিৎসকের অসাধ্য অনেক উৎকৃষ্ট ব্যাধি টোট্‌কা ঔষধে আরাম হইতে দেখিয়া আমরা বহুবার বিস্মিত হইয়াছি। সুদীর্ঘ কালে আমরা যতগুলি টোট্‌কা নানা লোকের নিকট হইতে সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, বিশেষ অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, তন্মধ্যে কতকগুলি ঔষধ প্রচলিত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। হয় ত অন্যগুলি কোন-না-কোন অপ্রচলিত শাস্ত্রে উক্ত রহিয়াছে। নূতন উদ্ভাবিত মুষ্টিযোগের প্রয়োগও অসম্ভবপর নহে।

আমরা "বিকঙ্কত কষায়" নাম দিয়া যে কষায়ের গুণ-প্রভাবের কথা বলিতেছি, তাহা একটী টোট্‌কা ঔষধের প্রয়োগ দেখিয়া, কিছু রূপান্তর করিয়া আমরা ব্যবহার করতঃ বড়ই সুফল লাভ করিয়া আসিতেছি। কি উপায়ে এই মহৌষধ জানা গেল এবং প্রয়োগ-সৌকর্য্যার্থে তাহার কিরূপ রূপান্তর করা হইয়াছে, তাহা অতি সংক্ষেপে বলিতেছি।

আমাদের গাঁয়ে একজন ব্রাহ্মণ সওয়া

পাঁচ আনার পয়সা লইয়া সূতিকার ঔষধ দিতেন। এক গোছা সরু সরু শিকড় দিয়া বলিয়া দিতেন,—"এই শিকড়গুলি সাতভাগ করিয়া, তাহার এক ভাগ আর ৭টা কৈ মাছ এবং আবশ্যকানুরূপ তরকারি ও লবণ, হলুদ প্রভৃতি মসলা দিয়া ঝোল রাঁধিবে। সেই ঝোলের সঙ্গে উচিত পরিমিত অন্ন মধ্যাহ্নে ভোজন করিবে। মাছ-তরকারি—সমস্তই খাইবে। ভাতের সঙ্গে আর কিছুই খাইবে না। রাত্রিকালে লঘু-পথ্য করিবে। প্রতিদিন এইরূপ করিলে, ৩ হইতে ৭ দিনের মধ্যে আরোগ্য লাভ করিবে"। তাঁহার ঔষধে অনেক সূতিনী আরোগ্য লাভ করিতেন। অনুসন্ধানে জানা গেল, উহা বিকঙ্কত অর্থাৎ বৈঁছির শিকড়। আমি বৈঁছির সূক্ষ্ম শিকড় এবং স্থূল শিকড় বা মূলের ছাল লইয়া, কষায় প্রস্তুত পূর্ব্বক প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করি। তাহাতেই সুফল ফলিতে লাগিল। বলা বাহুল্য যে, বিকঙ্কতের মূলের ছাল এবং সূক্ষ্ম শিকড়ের পরিমাণ ২ তোলা পেষণ করিয়া, আধসের জল সহ পাক করতঃ আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া, ছাঁকিয়া পান করিবে। সাতদিনের মধ্যে দুঃসাধ্য সূতিকা রোগ আরোগ্য হয়। আমাদের "আয়ুর্ব্বেদের" পাঠিকাগণের মধ্যে যিনি এই কষায় ব্যবহার করিয়া সুফল দর্শন করিবেন। তিনি কৃপা পূর্ব্বক তাহা জানাইলে, আমরা অনুগৃহীত হইব।

পিপ্পল্যাদিগণের কষায়।

তিন বা তদধিক ভৈষজ্য সমবায়ে কল্পিত যোগসমূহের মধ্যে কতকগুলি যোগ 'গণ'-সংজ্ঞক। যে সকল দ্রব্যযোগে যে গণ পরিকল্পিত, প্রায়শঃ সেই সকলের আদি দ্রব্যের নামানুসারে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র 'গণের' নামকরণ করা হইয়াছে। যেমন বিদারিগন্ধাদিগণ, সারসালাদিগণ ইত্যাদি। মহর্ষি সুশ্রুত যে কয়েকটী গণ কল্পনা করিয়াছেন তন্মধ্যে পিপ্পল্যাদিগণ অন্যতম। সুশ্রুতোক্ত পিপ্পল্যাদিগণের দ্রব্য সংখ্যা দ্বাবিংশতি। চক্রপাণিদত্ত সেই বাইশখানি দ্রব্যের মধ্য হইতে দুইখানি দ্রব্য—বচ আর গজপিঁপুল বাদ দিয়া, কুড়িখানি লইয়া গণকল্পনা করিয়াছেন। "ভাবপ্রকাশে" লিখিত উক্তগণের দ্রব্য-সংখ্যা একবিংশতি। দীর্ঘকাল যাবৎ আমরা কোন স্থলে বাইশখানি দ্রব্য লইয়া, ক্বচিৎ একুশখানি দ্রব্যযোগে, কুত্রাপি বা চক্রদত্তের নির্দেশানুসারে কুড়িখানি দ্রব্য-সমবায়ে পিপ্পল্যাদিগণ কল্পনা করতঃ প্রয়োগ করিয়া দেখিয়াছি, সুফলের তারতম্য অবধারণ করিতে পারি নাই। তজ্জন্য অদ্যাবধি চক্রদত্তের মতানুসরণ করিয়া আসিতেছি। সুশ্রুত বলেন—

"পিপ্পল্যাদি কফহরঃ প্রতিশ্যায়ানিলারুচীঃ।
নিহন্যাদ্ দীপনো গুল্ম শূলঘ্নশ্চাম পাচনঃ।"

অর্থাৎ পিপ্পল্যাদিগণ কফরোগ নাশক, প্রতিশ্যায় নিবারক, বায়ুনাশক এবং অরুচিঘ্ন। দীপন, গুল্মঘ্ন, শূল-প্রশমন এবং আমপাচন—ইহার অপর চারিটী গুণ।

চক্রদত্ত বলেন—

পিপ্পল্যাদি কফহরঃ প্রতিশ্যারোচক-জ্বরান্
নিহন্যাদ্দীপনো গুল্মশূলঘ্নস্তাম পাচনঃ।"

চক্রপানিদত্ত পিপ্পল্যাদিগণের বায়ুপ্রশমনী শক্তি স্বীকার করিলেননা। সুশ্রুতোক্ত অপরাপর গুণগুলি গাঁথিয়া শ্লোক-রচনা করিলেন। অধিকন্তু বলিলেন,—পিপ্পল্যাদিগণ জ্বরঘ্ন। জ্বরঘ্ন বলিতে, অষ্টবিধ জ্বরনাশক

বুঝায়। সেই ব্যাপক অর্থ—তিনি সঙ্কোচ করিয়াছেন। যে হেতু কফজ্বর-চিকিৎসা প্রকরণেই পিপ্পল্যাদি কষায়ের উল্লেখ করিয়াছেন। পরন্ত সূতিকারোগাধিকারে, মক্কল বা মক্কন্দ শূল-প্রশমনের জন্য পিপ্পল্যাদিগণের কষায়ে সৈন্ধব প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে উপদেশ দিয়াছেন। পরবর্ত্তি কালে ভাবমিশ্রও এই গণের মক্কলশূল-প্রশমনী-শক্তি উপলব্ধি করিয়াছেন। দীর্ঘকাল যাবৎ বহু বহু স্থলে পিপ্পল্যাদিগণের কষায় এবং ক্বচিৎ পিপ্পল্যাদি গণোক্ত সমুদয় দ্রব্যের সমবেত চূর্ণ প্রয়োগ করিয়া, যেরূপ সুফল জানিতে পারিয়াছি, তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

যদি প্রসূতির শরীরে অপানবায়ু স্বস্থানে, স্বভাবে এবং স্বমানে রহিয়া, স্বকীয় কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে, তাহা হইলে, প্রসবান্তে গর্ভ ক্ষেত্রে সঞ্চিত ক্লেদ এবং চ্যুতরুধির নিঃশেষে বাহির হইয়া যায়। গর্ভক্ষেত্র প্রকৃতিস্থ হয়। প্রসূতিও অবিলম্বে স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করে। বিগুণ অপান বায়ু কুক্ষিগত অপপদার্থ নিঃসরণের বাধা দেয়। অনিঃসৃত ক্লেদ প্রভৃতি সঞ্চিত রহিলে শোষিত হইয়া রক্তগত হয়, তজ্জন্য প্রসূতির শরীরে নানা রোগ দেখা যায়।

প্রসবের পর কুক্ষিদেশ পরিষ্কার করিবার জন্য যে সকল ঔষধ প্রয়োগ করা যায় এবং যে যে উপায় অবলম্বন করা হয়, তন্মধ্যে কোন ঔষধই পিপ্পল্যাদিগণের কষায় বা চূর্ণ সেবনের ন্যায় সুফলপ্রদ নহে। প্রতিদিন প্রাতঃকালে গণোক্তবিংশতি দ্রব্যের প্রত্যেক দ্রব্য একে একে ওজন করিয়া লইয়া, একসঙ্গে কুটিয়া, মেটে পাত্রে কাঠের জ্বালে পাক করিবে। পাকসিদ্ধ হইলে পরিষ্কার কাপড়ে ছাঁকিয়া পান করিতে দিবে। অথবা গণোক্ত প্রত্যেক দ্রব্য একে একে সূক্ষ্মতম চূর্ণ করিয়া, পৃথক পৃথক রাখিয়া দিবে। পরে তুল্য-পরিমাণে সমস্ত দ্রব্য ওজন করিয়া লইয়া, একসঙ্গে উত্তমরূপে মিশাইয়া রাখিবে। মাত্রা ১০ রতি। অবস্থানুসারে উষ্ণজল, কাঁজি, দইয়ের মাত বা সুরার সঙ্গে সেবন করিতে দিবে।

প্রসবান্তে চ্যুতরুধির, প্রসূতির কুক্ষিদেশে আবদ্ধ রহিলে, বায়ু প্রকুপিত হইয়া হৃদয়ে, মস্তকে,—বিশেষতঃ বস্তিদেশে দুঃসহ শূল উৎপাদন করে। সেই শূলের নাম মক্কলশূল। মক্কলশূল প্রায়শঃ তিনদিন স্থায়ী হয়। কখন-কখন এই শূল দীর্ঘকাল স্থায়ী রহিয়া, সূতিনীকে দুঃসহ যন্ত্রণা দিতে থাকে। এই রোগে জ্বর, অরুচি, মুখদৌর্গন্ধ প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হয়। পিপ্পল্যাদি কষায় পান করাইলে সোপদ্রব মক্কলশূল অচিরে প্রশমিত হয়। প্রতিদিন প্রাতঃকালে কষায় পান করিতে দেওয়া উচিত।

প্রসবান্তে গাত্র-বেদনা থাকিলে উক্ত কষায় ব্যবস্থা করিলে, বিশেষ সুফল পাওয়া যায়।

প্রসূতির অঙ্গে আমরস সঞ্চিত রহিলে, আমাপচনার্থ উক্ত পাচন ব্যবস্থেয়। তদ্ভিন্ন মন্দানল রোগে এবং সূতিকা-গ্রহণী রোগেও পিপ্পল্যাদি কষায় হিতকর।

পিপ্পল্যাদিগণের পত্রী—

(১) পিপুল, (২) পিপুলের মূল, (৩) চই (৪) চিতা, (৫) শুঁঠ, (৬) মরিচ, (৭) এলাচ, (৮) যোয়ান, (৯) ইন্দ্রযব, (১০) আকনাদি, (১১) রেণুকা, (১২) জীরা, (১৩) বামন হাটী, (১৪) মহানিমের ফল, (১৫) হিং, (১৬) কটুকী,

(১৭) সর্ষপ, (১৮) বিড়ঙ্গ, (১৯) আতইচ, (২০) মূর্ব্বা।

প্রতিদ্রব্য ৮ রতি (আটটী কুঁচের ওজন) গ্রহণ করিবে। প্রস্তুত-প্রণালী বলা হইয়াছে।

দ্রব্য গ্রহণের নিয়ম—

(১) পিঁপুল—সুপরিচিত ভৈষজ্য। সংস্কৃত নাম পিপ্পলী, কণা প্রভৃতি। পাটনাই পিঁপুলের চেয়ে দেশী পিঁপুল সমধিক গুণশালী। অভিনব পিঁপুল ঔষধার্থ প্রশস্ত নহে। সুপরিপক্ক পিঁপুল সংগ্রহ করিয়া শুকাইয়া রাখিতে হয়। এক বৎসরকাল অতিক্রম করিলে, ঔষধের কাজে ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু গন্ধ-বর্ণ-রসভ্রষ্ট হইলে পিঁপুল এবং অপর সমস্ত ভৈষজ্য নির্গুণ হইয়া যায়। পিঁপুলের মঞ্জরী ত্যাগ করিয়া দানাগুলি গ্রহণ করিতে হয়। (২) পিঁপুলের মূল—পিঁপুলের গাছ লতাজাতীয়। লতিকার মূলদেশে যে সকল গ্রন্থি (গাঁইট) জন্মে, তাহাই ঔষধ কর্ম্মে প্রশস্ত। ইহার সংস্কৃত নাম গ্রন্থিক। চলিত নাম গেঁঠেলা। গ্রন্থির অভাবে মূল বা শিকড় গ্রহণ করা যাইতে পারে। (৩) চই—ইহার সংস্কৃত নাম চবিকা। চই লতা জাতীয় উদ্ভিদ। বৃক্ষমূলে চইর লতা রোপণ করিলে, কাপে কাপে যে গুচ্ছাকার শিকড় জন্মে, তাহা গাছের গায়ে লাগিয়া, গাছ বাহিয়া উঠিতে থাকে। ইহার পাতার আকৃতি পানের ন্যায়। পূর্ব্ব-উত্তর-বঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে চইর চাষ হয়। ইহার মূল, শিকড় এবং কাণ্ড ব্যঞ্জনে কটুরসাধানের জন্য ব্যবহৃত হয়। ঔষধার্থ মূল বা শিকড় ব্যবহার্য্য। কলিকাতার পশারির দোকানে চই চাহিলে এক প্রকার কাষ্ঠ দেয়। তাহার আস্বাদও চইয়ের ন্যায় ঝাল। কিন্তু উহা প্রকৃত চই নহে। বঙ্গদেশ ভিন্ন অন্যত্র চই জন্মে না। তজ্জন্য অন্যান্য দেশের লোকে চই চিনেন না। তাই প্রসিদ্ধ টীকাকার ডল্লনাচার্য্য চইর অর্থ লিখিয়াছেন—গজপিঁপুলের মূল। (৪) চিতা—ইহার সংস্কৃত নাম চিত্রক, বহ্নি প্রভৃতি। শ্বেত ও রক্ত ভেদে চিত্রক দুই প্রকার। শ্বেত চিতার ফুল শুক্লবর্ণ, রক্তচিতার পুষ্পস্তবক উজ্জ্বল রক্তবর্ণ। সাদা চিতার শিকড় কাষ্ঠগর্ভ; লাল চিতার শিকড় কলার শিকড়ের ন্যায়। শিকড়াভ্যন্তরে একটী আঁশ থাকে। ঔষধার্থে লাল চিতার শিকড় ব্যবহার করিতে হয়। মাত্র যেখানে শ্বেত চিতার শিকড় দিবার উপদেশ থাকে, সেইখানেই তাহা দিতে হয়। শরীরের বহিঃপ্রদেশে রক্তচিতা লাগাইলে বিষক্রিয়া করে। অনেকে স্ত্রীশরীরে রক্তচিতা প্রয়োগ করিতে আপত্তি করেন। বাহ্য প্রয়োগে গর্ভপাতের কথা শুনিয়া, এই প্রকার সংস্কার জন্মিয়া থাকিবে। কিন্তু উপযুক্ত মাত্রায় রক্ত চিতা সেবন করিলে; গর্ভ শয্যায় ইহার কোন মন্দ ফল প্রকাশ পায় না। নির্ভয়ে গর্ভিনী রোগে, সূতিকা পীড়ায় এবং অন্যান্য রোগে স্ত্রীশরীরে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। (৫) শুঁঠ—সংস্কৃত নাম শুণ্ঠী প্রভৃতি। শুঁঠ প্রসিদ্ধ ভৈষজ্য। টাট্‌কা শুষ্ক শুঁঠ উত্তমরূপে ধুইয়া, শুকাইয়া ঔষধার্থ ব্যবহার করিবে। (৬) মরিচ—প্রসিদ্ধ দ্রব্য। গোল মরিচ নামে বিখ্যাত। মরিচ জলে ফেলিলে যে গুলি ভাসিয়া যায়, সেগুলি ত্যাগ করিয়া, অবশিষ্ট মরিচ শুকাইয়া লইবে। (৭) এলাচ—ছোট এলাচের খোসা ত্যাগ করিয়া দানা গ্রহণ করিবে। (৮) যোয়ান—পিপ্পল্যাদি কষায়ে অজমোদা দিবার উপদেশ আছে। অজমোদার অর্থ বন যোয়ান। আভ্যন্তর-

প্রয়োগে অজমোদা অর্থাৎ বনযোয়ান না দিয়া, প্রসিদ্ধ টীকাকার শিবদাস, যোয়ান দিতে বলেন। বাহ্য প্রয়োগে অজমোদা অর্থে বন যোয়ান বুঝিতে হইবে। (৯) ইন্দ্রযব—কুটজ অর্থাৎ কুড়্চি ফলের বীজ। ক্রীত বীজ জলে ফেলিলে যে গুলি ভাসিয়া উঠে, তাহা ত্যাগ করিয়া, নিমজ্জিত বীজগুলি শুকাইয়া লইবে। (১০) আকনাদি—সংস্কৃত নাম পাঠা। ইহা লতা জাতীয় উদ্ভিদ্। আঁকাসি, আকনাদি, আকনিধি, এবং নিমুখী প্রভৃতি নামে স্থানে স্থানে পরিচিত। লতিকার মূল এবং শিকড় ঔষধার্থ গ্রহণ করিতে হয়। অভাবে লতা-পাতা দিলেও কষায়ের গুণের তারতম্য উপলব্ধি করা যায় না। (১১) রেণুক—অসম গাত্র, গোলাকার, ঈষল্লোহিত পাণ্ডুবর্ণ, মরিচের আকারের ন্যায় বীজ-বিশেষ। পশারির দোকানে কিনিতে পাওয়া যায়। এই বীজ অল্প মাত্রায় প্রয়োগ করিলে গর্ভাশয়ের জরায়ু বললাভ করে এবং সঙ্কুচিত প্রসারিত হইতে থাকে। তজ্জন্য গর্ভাশয়ে সঞ্চিত ক্লেদ প্রভৃতি নিঃসৃত হইয়া যায়। অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিলে গর্ভাশয় আক্ষিপ্ত হইতে থাকে। গর্ভিনীর পক্ষে রেণুকের প্রয়োগ অনিষ্টকর। (১২) জীরা প্রসিদ্ধ বণিক দ্রব্য। ক্রীত-জীরক ঝাড়িয়া বাছিয়া পরিষ্কার করিয়া লইবে। কারণ জীরার সহিত অন্যান্য বীজ প্রভৃতি মিশান থাকে। (১৩) বামনহাটী—সংস্কৃত নাম ব্রহ্মযষ্টি, ভার্গী প্রভৃতি। বা'ন্‌যষ্টি, ভামট প্রভৃতি নামে স্থানে স্থানে পরিচিত। ইহার মূলক বা শিকড়ের ছাল গ্রহণ করিবে। (১৪) মহানিমের ফল—ফলের আবরণ ত্যাগ করিয়া অভ্যন্তরের শাঁস গ্রহণ করিবে। ইহার গাছ অসুলভ নহে। গাছ হইতে ফল আহরণ করা যাইতে পারে। বেণের দোকানেও পাওয়া যায়। (১৫) হিং—মুলতানি হিং গ্রহণ করিবে। পাচনে প্রক্ষেপ দিবে না। অন্যান্য দ্রব্যের ন্যায় ৮ রতি পরিমিত হিং লইয়া একসঙ্গে কুটিয়া লইবে। মাত্রাধিক্যের আশঙ্কা নাই। (১৬) কট্‌কী—প্রসিদ্ধ বণিক্ দ্রব্য। টাট্‌কা কট্‌কী গ্রহণ করিবে। (১৭) সরিষা—সদাসর্যপ গ্রহণ করিবে। (১৮) বিড়ঙ্গ—বিড়ঙ্গ কিঞ্চিৎকালের পুরাতন প্রশস্ত। ইহার খোসা ছাড়াইয়া অভ্যন্তর ভাগে যে গোলাকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানা থাকে, তাহা ঝাড়িয়া বাছিয়া গ্রহণ করিবে। (১৯) আতইচ—প্রসিদ্ধ বণিক্ দ্রব্য। ক্রীত আত-ইচ উত্তমরূপে ধুইয়া শুকাইয়া লইবে। (২০) সুচমুখী—সংস্কৃত নাম মূর্ব্বা। বোড়াচক্র নামেও পরিচিত। গাছের পাতা ত্যাগ করিয়া মূল ও কাণ্ড গ্রহণ করিবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
কবিরত্ন।

কাজের কথা।

—:*:—

'চা'য়ে অনিষ্ট ;—দেশে 'চা' পায়ীর সংখ্যা যে পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে, সেই পরিমাণে সহরের অলিতে-গলিতে 'চা' বিক্রয়ের দোকানও দিন-দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। এক পয়সায় এক পেয়ালা চা,—একটু দুগ্ধ বেশী দিয়া রকমারি 'কাফে' দিলে না হয়—উহার মূল্য দুই পয়সা। ফলে এই এক পয়সা বা দুই পয়সার নেশায় কলিকাতা সহর মাতিয়া উঠিয়াছে। শুধু কলিকাতার কথা কেন, মফঃস্বলের সহর ঘেঁসা স্থানগুলিতেও এইরূপ 'চা'য়ের দোকান অনেক গুলি স্থাপিত হইয়াছে। এই 'চা'-পানে অজীর্ণ-অক্ষুধা প্রভৃতি অন্য অনিষ্ট যাহা হয়—তাহা ত হইতেছেই,—তাহা ভিন্ন ইহার দ্বারা আর একটি যে বিশেষ অনিষ্ট উপস্থিত হইতেছে, তাহা কেহ ভাবিয়াও দেখিতেছেন না। 'চা'য়ের দোকানের প্রায় সকল গুলিতেই এক-একটী বাল্‌তি পূর্ণ যে জল থাকে, উচ্ছিষ্ট বাটি বা কাফ্‌গুলি সেই বাল্‌তির জলে ডুবাইয়া পবিত্র করা হয়! ফলে ঐ একই বাল্‌তিতে এইরূপ ভাবে 'কাফ' পরিষ্কারে, উহা দ্বারা শুধু ব্যক্তি-বিশেষেরই উচ্ছিষ্ট যে পান করা হইতেছে, তাহা নহে,—ঐ জলপূর্ণ বাল্‌তিতে বহু-সংখ্যক ব্যক্তির উচ্ছিষ্ট মিশ্রিত হওয়ায় বহু-সংখ্যক ব্যক্তিরই উচ্ছিষ্ট উহা দ্বারা গ্রহণ করা হইতেছে। ইহা হইতে দোকানের 'চা'পানে জাতি-ধর্ম্ম ত রসাতলে যাইতেছেই, —তা ছাড়া অনেক সংক্রামক-ব্যাধিও ইহার ফলে বহুলোকের শরীরে প্রবেশ লাভ করিতেছে। দোকানদার ব্যবসায় করিতে বসিয়াছে, কাহার হাঁপ আছে, কাহার কাস আছে, কে সুস্থ, কে অসুস্থ,—এসকল ত তাহার বিচার করিবার আবশ্যক নাই, তাহার ব্যবসায়ের প্রসার বৃদ্ধি হইলেই যথেষ্ট হইল। ফলে বাঙ্গালী সন্তান এই 'চা' পানেও যে স্বাস্থ্যক্ষয় করিতেছে, তাহা সুনিশ্চয়।

* * * *

আমোদে আয়ুক্ষয়।—প্রত্যুষের পূর্ব্বে শয্যা ত্যাগ করিতে হয় এবং রাত্রি এক প্রহরের পর শয্যা-গ্রহণ করিতে হয়,—ইহাই সেকালে শাস্ত্রীয়-ব্যবস্থা ছিল। এখন সহরের বাবুরা আমোদে উন্মত্ত হইয়া,—সমস্ত রাত্রি জাগরণপূর্ব্বক, রঙ্গমঞ্চগুলির অভিনয় দেখিয়া থাকেন। এই দর্শকগুলির মধ্যে আবার বালক এবং যুবকের সংখ্যাই অধিক। ছাত্র বা Student হিসাবে যাঁহারা অভিভাবক-শূন্য হইয়া, সহরে অবস্থিতি করিতেছেন, বালক এবং যুবকদলের মধ্যে হিসাব-গণনায় তাঁহাদিগেরই সংখ্যা অধিক। শাস্ত্রবাক্য অনুসারে বালক এবং যুবকের শ্রেণী-বিভাগে, আমরা ষোড়শ বর্ষীয়গণকে বালক এবং তাহার পর হইতে যুবক বলিয়া স্থির করিয়া লইতেছি। যাহা হউক, উহারা পঠদ্দশায় ব্রহ্মচর্য্য ত্যাগ করিয়া, স্ত্রী-অভিনেত্রীর হাবভাবদর্শনে, রাত্রি-জাগরণের স্বাস্থ্যক্ষয়ের কারণ অপেক্ষাও অধিকতর স্বাস্থ্য ক্ষয়ের যে কারণ উপস্থিত করিতেছে, তাহা অবিসংবাদিত। ইহা হইতে রমণী-সুখ-মিলনের চিন্তা অলক্ষিতভাবে সুকুমার কৈশোর জীবনে প্রবেশলাভ পূর্ব্বক তাহদিগের ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্য-সুখ একেবারে নষ্ট

করিয়া তুলিতেছে, ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। হায়! বাঙ্গালী অভিভাবক কবে এ সকল কথা বুঝিবে?

* * * *

ব্যসনে স্বাস্থ্যহানি।—আগে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বাঙ্গালী, তৈলের অভ্যঙ্গ করিত। এখন অনেকস্থলে দেশ হইতে সে প্রথা উঠিয়া গিয়াছে। এখন একটু সুগন্ধি তৈল—যাহা মাথায় না দিলে নহে, অনেকে তাহাই দিয়া থাকেন, তাহা ভিন্ন দেহের সকল স্থানে 'সাবান'-মর্দ্দনের ব্যবস্থা হইয়াছে। শাস্ত্রে তৈল-মর্দ্দনের উপকারিতা যাহা লিখিত আছে, সাবান মর্দ্দনে কখনই তাহা সিদ্ধ হয় না। শাস্ত্রকার বলিয়া গিয়াছেন,—তৈল মর্দ্দনে ঘৃতপানেরও অষ্ট গুণ ফললাভ ঘটিয়া থাকে। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য প্রায় সকলপ্রকার তৈলকেই শাস্ত্রকারগণ বৃষ্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তৈল মর্দ্দনে বায়ু-পিত্ত এবং কফ—তিনটি ধাতুর সাম্য-ক্রিয়া সংসাধিত হয়। বাঙ্গালী যুবকের নিকট কিন্তু এ কথা বুঝাইবে কে? ফলে এই তৈলত্যাগী হওয়ার জন্যও বাঙ্গালী স্বাস্থ্যোন্নতির অন্তরায় করিয়া তুলিতেছে।

* * * *

ক্রিয়ার বিপত্তি।—হেঁড়ে ডুডু, হাডুগুডু, লুকোচুরি, কপাটি—সেকালে বাঙ্গালী বালকের জন্য এই সকল খেলার প্রথা নির্দ্দিষ্ট ছিল। তাহার পর, সে সকল উঠিয়া গিয়া, ব্যাটবলে বাঙ্গালী-বালকের খেলার কার্য্য সিদ্ধ হইতে লাগিল। এখন একেবারে তাহাও উঠিয়া 'ফুটবলে' বাঙ্গালী-বালকের খেলার কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে। ফুটবল খেলিতে হইলে, যেরূপ আহার্য্যের প্রয়োজন, বাঙ্গালী বালকের জন্য সেরূপ আহার্য্যের ব্যবস্থা কিন্তু নির্দ্দিষ্ট নাই। যে সমাজ হইতে 'ফুটবল' খেলার সৃষ্টি হইয়াছে, সে সমাজে মাংস-ভক্ষণের ব্যবস্থা নিত্য প্রচলিত আছে। এদেশে সেরূপ নিত্য মাংস ভক্ষণ ত দূরের কথা,—অনেকের ভাগ্যে এক সপ্তাহ অন্তরও তাহা জুটিয়া উঠে কি না সন্দেহ। ইহা ভিন্ন দুগ্ধ দধি-ক্ষীর-ছানা-ভক্ষণের উপায় ত দেশ হইতে লোপ-ই পাইয়াছে। এ অবস্থায় 'ফুটবল' খেলিতে হইলে যেরূপ সামর্থ্যের প্রয়োজন, বাঙ্গালী-বালকের শরীরে সে সামর্থ্য নাই। কাজেই ওরূপ খেলায় মানসিক তৃপ্তি যথেষ্ট স্ফুরিত হইলেও উহাদ্বারা বাঙ্গালী-বালকের শক্তি ক্ষয় ঘটিতেছে। বাঙ্গালী বালকগণের কর্তৃপক্ষমণ্ডলী এ সকল কথা চিন্তা করিবেন কি।

* * * *

উপচক্ষুর অপকারিতা।—সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধির জন্য আজকাল অনেকেই চস্‌মা বা উপচক্ষু ব্যবহার করিয়া থাকেন দেখিতে পাই। বালক এবং যুবক-মহলেই ইহার প্রচলন অত্যধিক। দৃষ্টিশক্তির কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই, তথাপি সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য Power হীন চস্‌মা গ্রহণ করিতে হইবে, ইহা অনেকেরই একটা রোগে দাঁড়াইয়াছে। ফলে, অসময়ে এবং অকারণে উপচক্ষু গ্রহণ করায় সত্য সত্যই অনেকের দৃষ্টিশক্তি কমিয়া যাইতেছে। তৈল-মর্দ্দনে চক্ষুর জ্যোতি বর্দ্ধিত হয়, বাঙ্গালী সে তৈল মর্দ্দন ভুলিয়াছে, ঘৃত-দুগ্ধ-মৎস্য ভক্ষণে দৃষ্টিশক্তির প্রখরতা অটুট থাকে, বাঙ্গালীর তাহা পাইবার উপায় কমিয়াছে,—ব্রহ্মচর্য্য-পালনে মানব তীক্ষ্ণদৃষ্টি সম্পন্ন হইয়া থাকে, বাঙ্গালী বালক সে ব্রহ্মচর্য্য-পালনে অনভ্যস্ত হইয়াছে, ইহার উপর উপচক্ষু-ধারণে বাঙ্গালী-

বালকের ভবিষ্যৎ দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইবার কারণ, তাহারা নিজেরাই করিয়া তুলিতেছে। এটও বাঙ্গালী অভিভাবকের চিন্তা করিবার বিষয়।

* * * *

সিগারেটে সর্ব্বনাশ।—সিগারেটে বাঙ্গালীর বিলক্ষণ সর্ব্বনাশ সাধিত হইতেছে। ইহার প্রচলন-বিষয়েও বাঙ্গালীর আশা-ভরসা-স্থল — যুবকমণ্ডলীই অগ্রণী। আমাদের দেশে তামাকের ধূমপানের প্রচলন আছে, তাহা শিরোরোগনাশক, ক্ষুধা বৃদ্ধিকারক এবং বমনকারক বলিয়া শাস্ত্রে লিখিত। শাস্ত্রকার বলিয়া গিয়াছেন,—"তামাক স্বয়ং বিষ হইয়াও উপযুক্তরূপে প্রযুক্ত হইলে সকলপ্রকার বিষের নাশক হইয়া থাকে।" সিগারেট কিন্তু আমাদের দেশীয় তাম্রকূট নহে। উহাকে শীতপ্রধান দেশের উত্তেজক মাদক বলা যাইতে পারে। উহার অতিরিক্ত ব্যবহারে মস্তিষ্ক বিকার, বক্ষঃস্থলের পীড়া,—অনেকপ্রকার ব্যাধিই শরীর মধ্যে উপস্থিত হইতে পারে। তামাকের মত সিগারেট কলিকায় সাজিয়া ফুঁ দিয়া ধরাইবার প্রয়োজন হয়না বলিয়া, ইহার ব্যবহারটাও অনেকের নিকট ঘন ঘন দাঁড়াইয়াছে। ফলে অপরিণতবয়স্ক বাঙ্গালী-বালকগণ এই সিগারেটের ধূমেও স্বাস্থ্যরক্ষার অপচয় করিয়া তুলিতেছে। দেশে বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যক্ষয়ের কারণ চতুর্দ্দিকে এতই বিস্তৃত হইয়াছে, যে, তাহা হইতে বাঙ্গালীর নিষ্কৃতি পাইবার উপায় সুদূরপরাহত। এই সিগারেটের হস্ত হইতে বাঙ্গালী সন্তান যে কিরূপে নিষ্কৃতি পাইবে, তাহার উপায় ত একেবারেই দেখিতেছি না।

শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত।

গ্রীষ্ম-চর্য্যা।

স্বাস্থ্যরক্ষায় যত্নশীল ব্যক্তিদিগের জন্য বর্ত্তমান-গ্রীষ্ম-সমাগমে "গ্রীষ্ম-চর্য্যা"র বিষয় লিখিত হইতেছে। স্বাস্থ্যকামী ব্যক্তিগণ এই সময় এই প্রবন্ধের লিখিত নিয়মগুলি পালন করিলে, স্বাস্থ্য-সুখলাভ করিতে সক্ষম হইবেন।

এই সময় সূর্য্যের তেজ অতিশয় খরতর হয়, এজন্য কফের ক্ষয় এবং বায়ুর বৃদ্ধি ভাব হইয়া থাকে। এই কারণে এসময় লবণ, কটু ও অম্ল-রসযুক্ত দ্রব্য ব্যবহার বিধেয় নহে। শাস্ত্রকার এই ঋতুর পথ্য-নির্ব্বাচনে বলিয়া গিয়াছেন,—

"ভজেন্মধুর যে বান্নং লঘুস্নিগ্ধং হিমং দ্রবম্।
সুশীত তোয়সিক্তাঙ্গো লিহ্যাৎ সক্তূন্ সশর্করান্॥"

অর্থাৎ এ সময় মধুর, লঘু, স্নিগ্ধ, শীতল ও দ্রব অন্ন এবং শর্করা মিশ্রিত সজল শক্তু, ভোজন ও প্রত্যহ সুশীতল জলে স্নান করা কর্ত্তব্য।

জাঙ্গল মাংসের সহিত শুভ্র-শালি ধান্যের অন্ন ভোজন এ সময় প্রশস্ত। পানীয় জল কর্পূর সংযোগে সুগন্ধিকৃত করিয়া কুঁজা, কলসী প্রভৃতি মৃৎপাত্রে রক্ষিত করিবে। ব্যায়াম এবং রৌদ্র সেবন এই ঋতুতে বিষবৎ পরিত্যাজ্য। দিবানিদ্রা দ্বারা কফ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়—এজন্য ইহা অধিকাংশ স্থলে অহিতকর হইলেও গ্রীষ্মকালে কফের ক্ষয় নিবন্ধন ইহা দ্বারা বিশেষ অনিষ্টের আশঙ্কা নাই।

এই ঋতুতে মধ্যাহ্ন সময়ে বিশ্রাম করা একান্ত আবশ্যক। শাস্ত্রকার এ সম্বন্ধে বলিয়া গিয়াছেন,—

অভ্রংকষমহাশাল তালরুদ্ধোষ্ণ রশ্মিষু।
বনেষু মাধবী শ্লিষ্ট দ্রাক্ষাস্তবক শালিষু॥
কদলীদল-কহ্লার মৃণাল-কমলোৎপলৈঃ।
কোমলৈঃ কল্পিতে তল্পে হসৎকুসুমপল্লবে॥
মধ্যন্দিনেঽর্ক তাপার্ত্তঃ স্বপ্যাদ্ধারা গৃহেস্বুখম্।
নিশাকরকরাকীর্ণে সৌধপৃষ্ঠে নিশাসু চ॥
আসনা স্বস্থ চিত্তস্য চন্দনার্দ্রস্য মালিনঃ।
নিবৃত্ত কাম তন্ত্রস্য সুসূক্ষ্ম তনু বাসবঃ॥

অর্থাৎ অত্যুচ্চ শাল ও তাল বৃক্ষাকীর্ণ, রৌদ্রহীন-মাধবী-জড়িত-দ্রাক্ষাস্তবক শোভিত বনমধ্যে ধারা-গৃহে কোমল-কদলীপত্র, কহ্লার, মৃণাল, পদ্ম ও কুমুদ নির্ম্মিত পুষ্প-পল্লবাস্তীর্ণ-শয্যায় শয়ন করিয়া গ্রীষ্মকালে মধ্যাহ্ন যাপন করিবে। রাত্রিতে চন্দন-চর্চ্চিত দেহ, মাল্যধারী, সুস্থির চিত্ত, সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধায়ী ও কাম কর্ম্ম বিরহিত হইয়া, চন্দ্র-কিরণ প্রদীপ্ত-সৌধোপরি অবস্থিতি করিবে। এ সময় জলযুক্ত তালবৃন্তে ব্যজন গ্রহণ করিবে,—ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পদ্মিনী পত্র ও জলসিক্ত চামর বীজন দ্বারা গ্রীষ্ম জনিত ক্লান্তি নিবারণ করিবে

মদ্যপান এ ঋতুতে অতিশয় অহিতকর। নিতান্ত অভ্যাস পরায়ণ ব্যক্তিগণের পক্ষে মদ্যপান করিতে হইলে, সুরার সহিত অত্যধিক পরিমাণে জল মিশাইয়া পান করা কর্ত্তব্য। ইহার অন্যথায় শোথ, দেহের শৈথিল্য, দাহ ও মূর্চ্ছা রোগ হইবার সম্ভাবনা।

শাস্ত্রকার গ্রীষ্মঋতুর বর্ণনায় সকল কথা বলিয়া শেষ কথা বলিয়াছেন,—

মৃণাল বলয়াঃ কান্তা প্রোৎফুল্ল কমলোজ্জ্বলাঃ।
জঙ্গমা ইব পদ্মিণো হরন্তি দয়িতাঃ ক্লেশম্॥

অর্থাৎ এ সময় মৃণাল-বলয়ধারিনী, বিকসিত কমলোজ্জ্বলশালিনী, সুন্দরী রমণী-দিগের সহিত প্রণয়ালাপ দ্বারা নিদাঘ জনিত সকল কষ্ট দূরিভূত হইয়া থাকে।

আয়ুর্ব্বেদে তক্র-রহস্য।

এখনকার দিনে পাশ্চাত্য চিকিৎসক সমাজের পক্ষ হইতে যে সকল তথ্য আবিষ্কৃত হইয়া থাকে, তদ্দর্শনে আমরা বিমোহিত হইয়া থাকি, কিন্তু সেই সকল তথ্য ইতিপূর্ব্বে আমাদিগের দেশীয় শাস্ত্রবিশারদগণ বলিয়া গিয়াছেন কিনা—সে সম্বন্ধে কোনরূপ বিচার করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করি না, ইহা আমাদিগের পক্ষে বড়ই লজ্জার কথা বলিতে হইবে। ডাক্তারি মতে আধুনিক অনেক রোগের পথ্যে ঘোল বা তক্র-পান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সে সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্রকারগণ ইতিপূর্ব্বে কিছু বলিয়াছেন কিনা, তাহা লইয়া একটু আলোচনা করিব।

আমাদের বেদ পারগ আর্য্যঋষিমণ্ডলী সকল বিষয়েরই আলোচনা করিবার সময় শুধু দ্রব্য মাত্রের নাম এবং সেই সকল দ্রব্য যে সকল রোগের পথ্য—মাত্র তাহাই বলিয়া ক্ষান্ত হন নাই, সেই সকল দ্রব্য কিরূপ ভাবে প্রস্তুত করিতে হয়, কিরূপ সময়ে—কিরূপ অবস্থায়—কিরূপ ঋতুতে তাহা ব্যবহার করিতে হয়—

এ সকল কথার সকল প্রকার আলোচনা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে করিয়া গিয়াছেন। ঘোলের অবস্থা বা তক্র সম্বন্ধে তাঁহারা যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

তক্রের নামকরণে শাস্ত্রকার বলিয়াছেন,

ঘোলস্ত মথিতং তক্রমুদশ্বিচ্ছচ্ছিকাপিচ
স সরং নির্জ্জলং ঘোলং মথিতং অসরোদকম।

অর্থাৎ—ঘোল, মথিত, তক্র, উদশ্বিৎ ও ছচ্ছিকা এইগুলি ইহার পর্য্যায়। তাহার পর কোন সময়ে কোন অবস্থায় ঐ কয়টি দ্রব্যের কি আখ্যা প্রদান করা হইবে, তাহা নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

"তক্রং পাদজলং প্রোক্ত মুদশ্বিন স্বর্দ্ধং বারিকম্
ছচ্ছিকা সারহীনা স্যাৎ স্বচ্ছা প্রচুর বারিকা"

অর্থাৎ সরসংযুক্ত নির্জ্জল দধির নাম—ঘোল, সরবিহীন নির্জ্জল দধির নাম মথিত, চতুর্থাংশ জলযুক্ত দধির নাম তক্র, অর্দ্ধেক জল সংযুক্ত দধির নাম উদশ্বিৎ, সারহীন দধির নাম ছচ্ছিকা এবং প্রচুর জল সংযুক্ত দধির নাম স্বাচ্ছা।

ইহারের গুণ ব্যাখ্যার শাস্ত্রীয় উক্তি এই রূপ বর্ণিত হইয়াছে—

ঘোলস্ত শর্করা যুক্তং গুণৈর্জ্জ্ঞেয়ং রসালবৎ।
বাতপিত্তহরং হ্লাদি মথিতং কফ পিত্তনুৎ।
তক্রং গ্রাহী কষায়াম্লং স্বাদুপাক রসং লঘুঃ।
বীর্য্যোষ্ণং দীপন' বৃষ্যং প্রীণনং বাতনাশনম্।

অর্থাৎ শর্করা মিশাইয়া ঘোল সেবনে রসালবৎ উপকার হইয়া থাকে, ইহা বায়ু ও পিত্তনাশক ও আহ্লাদজনক। মথিত পানে কফ এবং পিত্ত নাশ হইয়া থাকে। তক্র গ্রাহী, কষায় ও অম্লরস। ইহা জীর্ণ হইয়া স্বাদু রস প্রাপ্ত হয়। ইহা লঘু, উষ্ণবীর্য্য, দীপন, বৃষ্য, প্রীতিজনক, বায়ুনাশক।

রোগের পথ্য নির্ণয়ে শাস্ত্রবিদ্গণ ইহাকে গ্রহণী রোগের উৎকৃষ্ট পথ্য বলিয়া, তাহার পর অনেক রোগেই ইহা সেবনের ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন। যথা—

শীতকালেঽগ্নিমান্দ্যে চ তথা বাতাময়েষু চ
অরুচৌ স্রোতাসং রোধে তক্রং স্বাদমৃতোপমম্।
তত্ত্ব হন্তি গরচ্ছর্দ্দি প্রপক বিষম জরান্।
পাণ্ডুমেদো গ্রহণ্যর্শো মূত্রগ্রহ ভগন্দরান্॥
মেহং গুল্মমতীসারং শূল প্লীহোদরারুচী।
শ্বিত্র কোঠ গত ব্যাধিন্ কণ্ঠ শোথ তৃষাক্রিমীন্॥

অর্থাৎ শীতকালে, মন্দাগ্নিতে, বাতরোগে, অরুচিতে ও স্রোতঃসকলের রুদ্ধতা জন্মিলে, তক্র সেবনে অমৃতপানের ফললাভ ঘটিয়া থাকে। বিষ, বমি, প্রসেক, বিষমজ্বর, পাণ্ডু, মেদো, রোগ, গ্রহণী, অর্শ, মূত্রগ্রহ, ভগন্দর, মেহ, গুল্ম, অতিসার, শূল, প্লীহা, উদররোগ অরুচি, শ্বিত্র, কোষ্ঠগত ব্যাধি, কুষ্ঠ, শোথ, তৃষ্ণা ও ক্রিমিরোগ—তক্র সেবনে নিবারিত হইয়া থাকে।

উষ্ণকালে এবং ক্ষত, দৌর্ব্বল্য, ভ্রম, দাহ ও রক্তপিত্ত বিকৃতি হইলে তক্র সেবনের নিষেধ করিয়া সুস্থশরীরে তক্র সেবনের ফলশ্রুতি শাস্ত্রকার বলিয়া গিয়াছেন'—

"ন তক্র সেবী ব্যথতে কদাচিৎ
ন তক্র দগ্ধা প্রভবন্তি রোগাঃ
যথা সুরানাং অমৃতং সুখায়
তথা নরাণাং ভুবি তক্র মাহুঃ।"

অর্থাৎ—নিয়মিত তক্রসেবনে করিলে রোগ সকলের প্রাবল্য জন্মিতে পারে না। অমৃত পানে দেবতাদিগের যেরূপ সুখোৎপাদন

হইয়া থাকে, পৃথিবীতে মনুষ্যশরীরে তক্র সেইরূপ উপকারী জানিবে।

মনুষ্য-শরীরের এহেন উপকারী তক্র বায়ু বৃদ্ধি উপলব্ধি হইলে শুণ্ঠী ও সৈন্ধব লবণের সহিত, পিত্ত প্রকুপিত হইলে চিনির সহিত এবং কফ-প্রাবল্যে শুঁঠ পিপুল ও মরিচের গুঁড়া মিশাইয়া সেবন করিলে বিশেষ ফললাভ হইয়া থাকে।

হিং, জীরার গুঁড়া ও সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করিয়া তক্র সেবনে অরুচি অবস্থায় রুচি জন্মিয়া থাকে। এরূপভাবে সেবন করিলে অর্শ ও অতিসার রোগেও বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

পাঠক, এখন দেখিলেন ত, তক্র সেবনের ব্যবস্থা এখনকার নূতন উদ্ভাবনা নহে,—মানব জাতির কল্যাণেচ্ছু আর্য্য ঋষিমণ্ডলী বহুকাল পূর্ব্বে ইহার গুণ-পরিচয় লোকসমাজে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ এবং টোট্কা ঔষধ।

দু'দিন অন্তর পালা জ্বরের ঔষধ। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে, দু'দিন অন্তর পালাজ্বরে অনেক সময় অনেক ঔষধের প্রয়োগ ব্যর্থ হইয়া থাকে। ডাক্তারেরা প্রথম অবস্থায় পালার পূর্ব্ব দিন হইতে যথেষ্টরূপে কুইনাইন-প্রয়োগের ব্যবস্থা করেন, কিন্তু সকল স্থলে তাহাও কার্য্যকরী হয় না। এ অবস্থায় নিম্নলিখিত যোগটিতে অনেক সময় উপকার পাওয়া যায়, (১) 'বক'-পুষ্প বৃক্ষের ছাল, অনন্তমূল, গোক্ষুর বীজ, (আঁটি বাদ দিয়া) হরিতকীর শাঁস,—প্রত্যেক দ্রব্য আধ তোলা ওজনে লইয়া হামান দিস্তায় কুটিয়া লইবে। তাহার পর পাচন প্রণালীর নিয়মানুসারে আধসের জল দিয়া জ্বালে চড়াইয়া এক ছটাক অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া লও। প্রতিদিন প্রাতে উহা একেবারে পান করিয়া ফেল। এক সপ্তাহকাল এইরূপ ব্যবস্থা করিলেই জ্বরের আক্রমণ বন্ধ হইবে।

সর্দ্দি-কাশীর যোগ।—'বক' পুষ্প বৃক্ষের মূলের ছাল অর্দ্ধভরি এবং বচ অর্দ্ধভরি একত্র কুটিয়া [illegible] তঃ এক ছটাক অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া লও। ২।৩ বারে ২।৩ দিন সেবন কর, সর্দ্দি-কাশী সারিয়া যাইবে।

মলবদ্ধতার সহজ ব্যবস্থা।—ধল আঁকোর বা ধল আঁকড়া বৃক্ষের শিকড় তুলিয়া লইয়া, অল্প কুটিয়া পাচন-প্রণালীর নিয়মানুসারে অর্দ্ধ সের জলে জ্বাল দিয়া অর্দ্ধ পোয়া অবশেষে নামাইয়া লইবে। উহার সহিত একটু মধু মিশাইয়া প্রাতে ও বৈকালে দুই বারে পান করিয়া ফেল। যাঁহারা মলবদ্ধতার জন্য কষ্ট পাইয়া থাকেন, তাঁহাদিগের ইহা দ্বারা নিয়মিত দাস্ত পরিষ্কার হইবে।

কোষ্ঠ-কাঠিন্য আর একটি ব্যবস্থা।—সুপক্ব হরিতকীর আঁটি বাদ দিয়া, চারি আনা পরিমিত গুঁড়া এবং চারি আনা পরিমিত মিছরির গুঁড়া বা চিনি এক ছটাক গরম জলে মিশাইয়া রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্বে পান করিবে। প্রাতে ইহা দ্বারা উত্তমরূপে দাস্ত পরিষ্কার হইয়া যাইবে। যাঁহাদিগের ধাতু অতিশয় রুক্ষ, তাঁহাদিগের জন্য চারি আনা গুঁড়ার পরিবর্ত্তে ছয় আনা বা অর্দ্ধ তোলা সেবন করাও চলিতে

পারে। গুঁড়া করিতে অসুবিধা হইলে হরিতকী বাঁটিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতেও সেবন করিতে পারা যায়।

প্রস্রাবের জন্য পাথরকুচি :—কলেরা এবং অতিরিক্ত উদরাময়ে যেখানে প্রস্রাব হইতেছে না, সেস্থলে কতকগুলি পাথরকুচি, খানিকটা, সোরার সহিত মিশাইয়া তল পেটে প্রলেপ দাও। সহজে মূত্র নিঃসৃত হইবে।

রক্তামাশয়ের একটী ব্যবস্থা—কাঁটান'টের মূল সিকিভরি লইয়া চালুনি জল এবং ২।৩টী গোলমরিচ সহ বাটিয়া, একবার কি দুইবারে খাইয়া ফেল। এইরূপ ২।৩ দিন করিলেই রক্তামাশয় সারিয়া যাইবে।

প্রমেহে সোরা।—প্রমেহের অসহ্য যন্ত্রণার নিবৃত্তি করিবার জন্য সোরা একটী অব্যর্থ ঔষধ। অর্দ্ধ আনা পরিমিত সোরা এক ছটাক জলে ভিজাইয়া সেই জল পান করিলে প্রমেহ রোগের জ্বালা যন্ত্রণা উপশমিত হইয়া থাকে।

প্রদরের ঔষধ।—প্রদর রোগে স্ত্রী জাতির অত্যধিক স্রাব হইতে থাকিলে, কতকগুলি গাঁদা ফুলের পাতা তুলিয়া ছেঁচিয়া রস বাহির কর। উহার রস ১ তোলা এবং চাউল ধোয়া জল একত্র মিশাইয়া দুইবেলা সেবন করাও। এইরূপ ৩।৪ দিন করাইলে স্রাব নিঃসরণের নিবৃত্তি হইবে। (২) এইরূপ অবস্থায় দুগ্ধের সহিত চারি আনা পরিমিত শ্বেত বেড়েলার মূল বাটিয়া সেবন করিলেও উপকার হইয়া থাকে। (৩) যষ্টীমধু দুই তোলা এবং দুই তোলা চিনি চাউল ধোয়া জল সহ বাটিয়া অর্দ্ধেক করিয়া ২ বেলা সেবনে প্রদর রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

শিরঃপীড়ায় সুব্যবস্থা। - (১) অপরাজিতা ফুলের যে লতিকা, তাহার মূলাগ্র লইয়া, নস্য গ্রহণ করিলে শিরঃপীড়ায় উপকার হইয়া থাকে (২) অপরাজিতার মূল কর্ণদেশে বন্ধন করিলে শিরঃপীড়ার শান্তি হইয়া থাকে। (৩) গোলমরিচ ২১টী গুঁড়া করিয়া, এক-তোলা ভৃঙ্গরাজ বা ভীমরাজের রসে গুলিয়া বারংবার নস্যগ্রহন করিলে শিরঃপীড়ায় শান্তি হইয়া থাকে। (৪) চুল্লী বা উননের পোড়া মাটী চারি আনা ও গোলমরিচের গুঁড়া চারি আনা একত্র মিশাইয়া নস্য গ্রহণ করিলে শিরঃপীড়ায় শীঘ্র শান্তি হইয়া থাকে। (৫) দুগ্ধের সহিত শুঁঠের গুঁড়া বাটিয়া প্রলেপ দিলে শিরঃপীড়ায় উপকার হইয়া থাকে।

বহুমূত্রে সুব্যবস্থা।—(১) আমলকীর রস ১ তোলা অল্প মধুর সহিত মিশাইয়া দুই বেলা সেবনে বহুমূত্রের উপশম হইয়া থাকে। (২) কচি তালের মূল চারিআনা, কচি খেজুরের মূল চারি আনা, পাকা কলা একটি, দুগ্ধ সহ মিশাইয়া কয়েকদিন সেবন কর, বহুমূত্রের উপশম হইবে। (৩) চাউল ভাজার গুঁড়া মধুর সহিত মিশাইয়া খাইলে বহুমূত্রের উপশম হইয়া থাকে।

অজীর্ণ রোগে ব্যবস্থা।—(১) খানিকটা পাতি বা কাগজি লেবুর রস জলে গুলিয়া, অল্প চিনি মিশাইয়া, দুই বেলা পান কর, অপাক-অজীর্ণে বিশেষ উপকার পাইবে। (২) দিবসে এবং রাত্রিকালে আহারান্তে দুই আনা করিয়া বিটলবণের গুঁড়া জলের সহিত মিশাইয়া সেবন কর, বিশেষ ফলপ্রাপ্ত হইবে। (৩) দুই তোলা মুথা কুটিয়া লইয়া আধ সের জলে জ্বালে চড়াইয়া অর্দ্ধ পোয়া অবশেষে নামাইয়া লও। উহার সহিত একটু চিনি মিশাইয়া অর্দ্ধেক করিয়া দুই বেলা সেবন কর, অজীর্ণ নষ্ট হইয়া অগ্নি বর্দ্ধিত হইবে। এই কয়টি ব্যবস্থা অম্লপিত্তেও উপকার হইয়া থাকে।

শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় সম্বন্ধে কয়েকটী কথা।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় পরিদর্শন ব্যপদেশে বিদ্যালয়-ভবনে অনেক গণ্যমাণ্য ব্যক্তিরই মধ্যে মধ্যে শুভাগমন ঘটতেছে। এ পর্য্যন্ত অনেক মহানুভব ব্যক্তি এবং মহামান্য গবর্ণমেণ্ট সংশ্লিষ্ট রাজপুরুষগণ বিদ্যালয়-ভবনে আগমন করিয়া, বিদ্যালয়ের সকল অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক, ইহার উদ্যোগ কর্ত্তৃগণকে উৎসাহিত করিয়াছেন। সংপ্রতি গত গুড্‌ফ্রাইডের দিন বেলা ১১ ঘটিকার সময় অনারেবল এম, বিটসন্‌বেল সি, এস, আর, সি, আই, ই, সি, এফ, এস, আই, আই, সি, এস, এবং বেঙ্গল সিভিল হস্‌পিটালের ইনেস্‌পেক্‌টার জেনারল অনারেবল কর্ণেল ডব্লিউ, আর এডওয়ার্ড সি, ডি, বি, এম, এল, আই, সি, এস মহোদয়দ্বয় বিদ্যালয়ের সকল প্রকার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের অন্যতম সদস্য অনারেবল নবাব সামসুল হুদা মহোদয় তাহার কিছু পূর্ব্বেই বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। এই সকল উচ্চ রাজপুরুষবৃন্দের শুভাগমনে আমাদের আশা-ভরসা ক্রমশঃই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের সপ্ত অঙ্গ লুপ্ত দেখিয়া, শ্রী ভগবানের নাম স্মরণ পূর্ব্বক, তাহার উদ্ধার-সাধন মাত্র লক্ষ্য করিয়া, এরূপ একটি অসাধ্য-সাধন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে। দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিদিগের সকরুণ-দৃষ্টি পতিত হইলে, আমাদের আশা ফলবতী হইতে কয়দিন লাগিবে!

* * * *

কোচবিহারের সুযোগ্য দেওয়ান বাহাদুর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ সেন বি, এল, বার-এট্-ল, মহোদয় অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যালয় অনুগ্রহ-পূর্ব্বক পরিদর্শন করিয়া, বিদ্যালয়ের সাহায্য-কল্পে মাসিক ১০৲ টাকা দানের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন।

অনেকে স্বেচ্ছা প্রণোদিত হইয়া এখন বিদ্যালয় পরিদর্শনে আগমন করিতেছেন। আলিগড়ের লব্ধ প্রতিষ্ঠ উকিল শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীলাল মহোদয় অনুগ্রহপূর্ব্বক বিদ্যালয়ে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি বিদ্যালয় পরিদর্শনান্তর নগদ ৫০৲ বিদ্যালয়ের উন্নতি কল্পে সাহায্য প্রদান পূর্ব্বক উদ্যোগ-কর্ত্তৃগণকে প্রোৎসাহিত করিয়াছেন।

* * * *

লুপ্ত প্রায় আয়ুর্ব্বেদের পুনরুদ্ধারের জন্য অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তার বিষয় বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুমহিলাগণও উপলব্ধি করিতেছেন। শুধু যে উপলব্ধি করিতেছেন, তাহাই নহে, একটি হিন্দু মহিলা এই প্রয়োজনীয়তার বিষয় সম্যক উপলব্ধি করিয়া গত ২রা বৈশাখ আমাদিগের নিকট নগদ একশত টাকা প্রেরণ করিয়াছেন। এই দানশীলা রমণীর নাম—শ্রীমতী রাধাসুন্দরী দেবী। ইনি শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের মাতৃদেবী। আমরা তাঁহার পুত্রের মারফৎ এই দান প্রাপ্ত হইয়াছি।

* * * *

বিদ্যালয়ের উন্নতি-কল্পে আর কয়েকজন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি গত বৈশাখ মাসে নগদ অর্থ এবং কতকগুলি বিশেষ মূল্যবান্ পুস্তক যাহা দান করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করাও আবশ্যক বলিয়া মনে করিতেছি। নগদ অর্থ সম্বন্ধে চন্দননগর নিবাসী শ্রীযুক্ত নারাণ-চন্দ্র দে মহাশয় ২৫৲ টাকা এবং পুস্তক সম্বন্ধে খড়দহের স্বর্গীয় যাদব কিশোর গোস্বামী মহাশয়ের ভ্রাতুপুত্র শ্রীযুক্ত পুলিন কিশোর গোস্বামী ও শ্রীযুক্ত কিশোরী কিশোর গোস্বামী প্রভৃতি ভ্রাতৃবৃন্দ মিলিত হইয়া, স্বর্গীয় যাদবকিশোর গোস্বামী মহাশয়ের লাইব্রেরীটি

এই বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট লাইব্রেরীকে দান করিয়াছেন। এই দান প্রাপ্তি হইতে অনেকগুলি বহুমূল্য এবং উৎকৃষ্ট গ্রন্থ দ্বারা বিদ্যালয়-লাইব্রেরীর সম্পদ-সম্ভার সমধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে।

* * * *

দেশের ছোট-বড় সকল প্রকার জমীদারদিগের দৃষ্টি ইহার উপর অল্পে অল্পে পতিত হইতেছে; ইহা নিশ্চয়ই আশার কথা বলিতে হইবে। গত ৩রা বৈশাখ মেহেরপুরের সুপ্রসিদ্ধ জমীদার শ্রীযুক্ত ভূষণচন্দ্র মল্লিক ও শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মল্লিক এবং সোমড়া-আবদুল পুরের ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মজুমদার বিদ্যালয়পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহারা বিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধি কল্পে অনেক প্রকার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন বলিয়া, আমাদিগকে আশাপ্রদান করিয়াছেন। ফল কথা, এ সকলই যে বিদ্যালয়ের পক্ষে আশার বিষয়, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

* * * *

এরূপ একটি মহান্ কার্য্য সিদ্ধ করা একার কার্য্য নহে। ইহার জন্য প্রথমতঃ যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন। সে অর্থ-সংগ্রহের জন্য চেষ্টাশীল, উদ্যোগী এবং উৎসাহী-পুরুষের আবশ্যক। দেশের ধনকুবেরদিগকে মুক্তহস্ত করিবার জন্য সে উৎসাহ প্রয়োগ করিতে, হইবে। যাঁহাদিগের ইচ্ছা আছে, শক্তি আছে, সামর্থ্য আছে, দেশের কাজ করিতে, দেশের হিত করিতে,—জগতের মঙ্গলসাধন করিতে যাঁহাদিগের প্রবৃত্তি আছে, তাঁহারা এসময় নিশ্চেষ্ট না থাকিয়া, এই মহান্ কার্য্যে যোগদান করুন। আরোগ্য এবং দীর্ঘায়ু লাভ,—ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ—সকল কর্ম্মের মূলসূত্র। যখন আয়ুর্ব্বেদের সর্ব্বাঙ্গ অক্ষুণ্ণ ছিল, তখন মানবজাতি ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ—সকল প্রকার সম্পদ লাভেরই যে অধিকারী হইত—এ কথা বিশেষজ্ঞের অবিদিত নাই। তাহার অভাবেই বর্ত্তমান সময়ে ভারতভূমি জরা-মরণের লীলানিকেতন হইয়া পড়িয়াছে। দেশ-রক্ষায় মনোযোগ প্রদান করিতে হইলে, আগে দেশের লোককে স্বাস্থ্যবান ও দীর্ঘায়ুলাভের প্রকৃষ্ট পন্থা প্রদর্শন করিতে হইবে। অষ্টাঙ্গ-আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যালয় এই উদ্দেশ্য লইয়াই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দেশের প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তি ইহা উপলব্ধি করুন—ইহাই আমাদিগের বক্তব্য।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ে প্রবেশার্থি ছাত্রদিগের প্রতি বিজ্ঞাপ্ত।

আগামী আষাঢ় মাসের শেষভাগ হইতে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও বাঙ্গালা বিভাগের ছাত্রদিগের নূতন সেসন বা নব বর্ষের অধ্যয়ন আরম্ভ হইবে। সংস্কৃত ভাষায় যাঁহাদিগের জ্ঞান জন্মিয়াছে, তাঁহারাই সংস্কৃত বিভাগে অধ্যয়নের অধিকারীর হইবেন। বাঙ্গালা-বিভাগে, বাঙ্গালা ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি থাকা আবশ্যক এবং কিছু ইংরাজী শিক্ষা সমাপ্তির পর প্রবেশ করিতে হইবে। মধ্য ইংরাজী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বা ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাস পর্য্যন্ত পড়িয়াছেন,—বাঙ্গালা বিভাগের জন্য এরূপ ছাত্রদিগের আবেদনই গ্রহণ করা হইবে। এখন হইতে আবেদন করুন, নতুবা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ হইয়া গেলে আর কাহারও আবেদন গৃহীত হইবে না।

আবেদনে জাতি ও বয়সের কথা উল্লেখ করিবেন। অন্যান্য বিষয় জানিবার জন্য অর্দ্ধ আনার টিকিট সহ নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করিতে হইবে।

কবিরাজ শ্রীযামিনী ভূষণ রায়
কবিরত্ন এম্, এ, এম্, বি
অধ্যক্ষ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়।

জ্যৈষ্ঠের সূচী।

	বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
১।	আয়ুর্ব্বেদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ...	... ...	৩৭৭
২।	অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় ...	... ...	৩৮৩
৩।	শিশুর প্রবাহিকা ও রক্ত-প্রবাহিকা-চিকিৎসা	... ...	৩৮৫
৪।	কুষ্ঠ ও বাতরক্তের ভেদ নির্ণয় ...	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত	৩৯৩
৫।	শারীর বায়ু ...	কবিরাজ শ্রীহরমোহন মজুমদার	৩৯৮
৬।	"আয়ুর্ব্বেদে"র কষায় মাহাত্ম্য	কবিরাজ শ্রীশীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৪০৬
৭।	কাজের কথা	শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত	৪১৬
৮।	গ্রীষ্মচর্য্যা	... ...	৪১৮
৯।	"আয়ুর্ব্বেদে তক্র-রহস্য ...	... ...	৪১৯
১০।	পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ ও টোটকা ঔষধ	শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত	৪২১
১১।	অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় সম্বন্ধে কয়েকটী কথা	... ...	৪২৩
১২।	ছাত্রদিগের জন্য বিজ্ঞপ্তি ...	... ...	৪২৪

"আয়ুর্ব্বেদের" নিয়মাবলী।

১। আয়ুর্ব্বেদের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা, ডাক মাশুল ।৵০ আনা; আশ্বিন হইতে বর্ষারম্ভ। যিনি যে কোন সময়েই গ্রাহক হউন, সকলকেই আশ্বিন হইতে কাগজ লইতে হইবে। টাকাকড়ি কবিরাজ শ্রীযামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন এম-এ, এম-বি, ৪৬নং বিডন্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

২। মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে "আয়ুর্ব্বেদ" প্রকাশিত হয়। যে মাসের কাগজ সেই মাসের মধ্যে না পাইলে সংবাদ দিতে হয়। অন্যথা ঐ সংখ্যা পৃথক্ মূল্য দিয়া লইতে হইবে।

৩। প্রবন্ধ লেখকগণ কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন। যে সকল প্রবন্ধ মুদ্রণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত না হয়, সাধারণতঃ সেগুলি নষ্ট করা হইয়া থাকে, তবে লেখক যদি প্রত্যর্পণ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন এবং পুনঃ প্রেরণের টিকিট পাঠান, তাহা হইলে অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠান হইয়া থাকে।

৪। গ্রাহকগণ ঠিকানা পরিবর্ত্তনের সংবাদ যথাসময়ে জানাইবেন, নতুবা অপ্রাপ্ত সংখ্যার জন্য আমরা দায়ী হইব না। "আয়ুর্ব্বেদ" সম্বন্ধে কোন বিষয় জানাইতে হইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন নচেৎ কাজের বড়ই অসুবিধা হয়।

৫। রীপ্লাই কার্ড কিম্বা টিকিট না দিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না।

৬। বিজ্ঞাপনের হার—

মাসিক	এক পৃষ্ঠা	বা	দুই কলম		৮৲
,,	আধ ,,	,,	এক	,,	৪॥০
,,	সিকি ,,	,,	আধ	,,	২৸০
,,	অষ্টাংশ ,,	,,	সিকি	,,	১॥০

বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দিতে হয়, এক বৎসরের মূল্য অগ্রিম দিলে টাকায় এক আনা কম লওয়া হয়। পত্র ও প্রবন্ধাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কবিরাজ শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন
"আয়ুর্ব্বেদ" কার্য্যাধ্যক্ষ
২৯নং ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

২৯, ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় হইতে শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন দ্বারা প্রকাশিত ও ১৬১ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, গোবর্দ্ধন মেসিন প্রেস হইতে শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন দ্বারা মুদ্রিত।

আষাঢ়, ১৩২৪ "শরীর মাদ্যং খলু ধর্ম্ম-সাধনম্" Reg. C. 865.
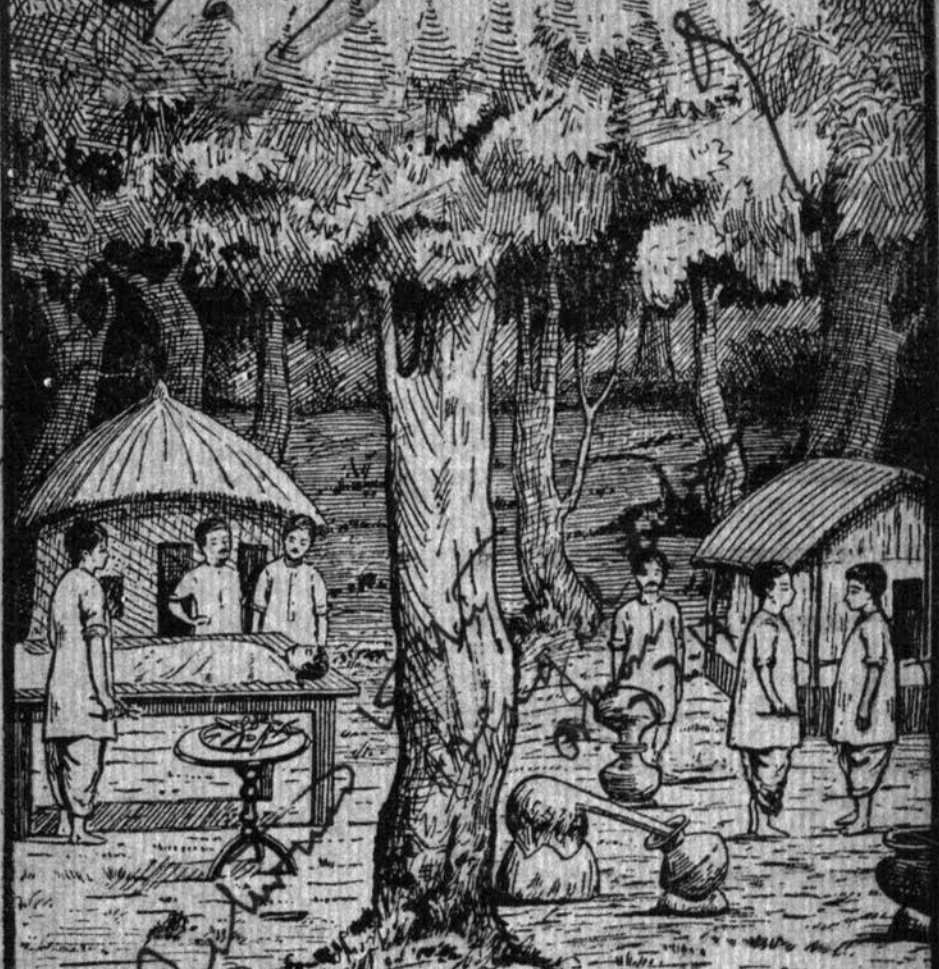
"অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়"

২৯. ফড়িয়া পুকুর ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

এক তলা

১। কায়চিকিৎসা বিভাগ।

২। শল্যচিকিৎসা বিভাগ।

৩। ঔষধালয়।

৪। বিকৃত শারীরদ্রব্য সম্ভার।

৫। ভেষজপরিচয়াগার।

৬। আফিস ঘর।

৭। ভেষজ ভাণ্ডার।

৮। শারীর পরিচয়াগার।

৯। রসশালা।

১০। বৃক্ষবাটিকা।

দো-তলা

১১—১৩। পাঠাগার।

১৪। গবেষণা মন্দির ও যন্ত্রশস্ত্রাগার।

১৫। অধ্যাপক সম্মেলন ও গ্রন্থাগার।

১৬। ঠাকুর ঘর।

আয়ুর্ব্বেদ
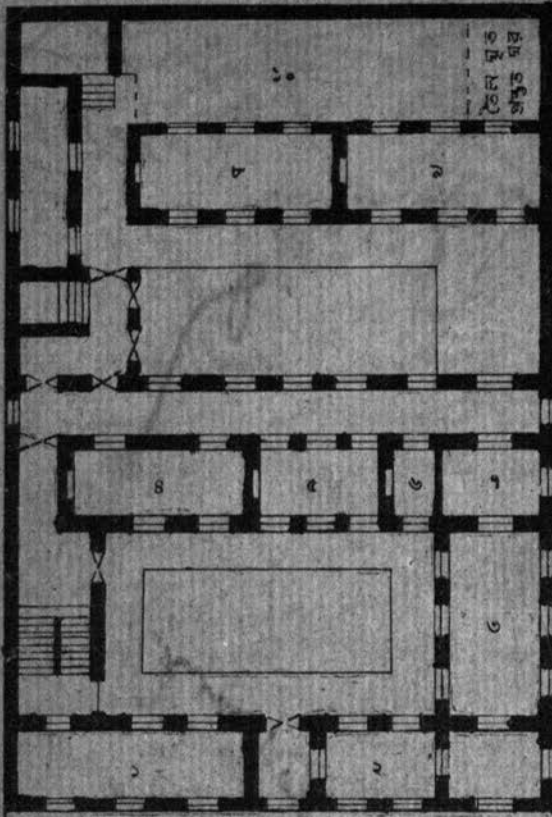
মাসিকপত্র ও সমালোচক।

১ম বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৪—আষাঢ়। | ১০ম সংখ্যা।

কাজের কথা।

—:০:—

আহারে অনিষ্ট।—আহারই প্রাণধারণের মূল। আহার্য্যের অভাব হইলে, কি স্থাবর, কি জঙ্গম—এমন কি, জড়পদার্থ—উদ্ভিদ্ পর্য্যন্ত জীবনধারণে সক্ষম হয় না। সেই আহার্য্য কিন্তু পরিমিত এবং বিশুদ্ধ হওয়া আবশ্যক। বর্ত্তমান সময়ে অম্ল-অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্য—এক কথায় ইংরাজী মতে ডিস্পেপসিয়া নামক ভীষণ ব্যাধি—যাহা বাঙ্গালা জুড়িয়া একাধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হইয়াছে, আহার বিষয়ের অমিত আচরণই তাহার একটা বিশেষ কারণ বলিয়া আমরা মনে করি। হিন্দু বাঙ্গালী-সাত্ত্বিক আহারে সেকালে বল-সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করিত, এখন সে সাত্ত্বিক-আহারের ব্যবস্থা দেশ হইতে একরূপ লুপ্তই হইয়াছে। হিন্দুজনোচিত খাদ্য-বিচারের ব্যবস্থা একালে অনেক হিন্দুসন্তানই যে ভুলিয়াছে, ইহা নির্ভেজ সত্য কথা। দুগ্ধ-ঘৃত-মাখন-দধি—যে সকল দ্রব্য আহার করিলে, শরীর পুষ্ট হইবে, কান্তি-দ্যুতি বর্দ্ধিত হইবে, হৃদয়-তন্ত্রী পবিত্রতা পূর্ণ হইবে, বাঙ্গালীর নিকট সে সকল দ্রব্য এখন সহজ-সুলভও নাই,—সেই সঙ্গে সেই সকল দ্রব্যের আস্বাদ লাভে বাঙ্গালীর শ্রদ্ধাও যেন হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। ঐ সকল দ্রব্যের রূপান্তরে প্রস্তুত বাজারের খাবারে অনেক বাঙ্গালীই এখন রসনার পরিতৃপ্তি-সাধন করিয়া থাকেন। বাজারের শিঙ্গাড়া-কচুরি, বাজারের চপ্-কাট্‌লেট্—ধর্ম্মাধর্ম্ম ভুলিয়া বাঙ্গালী এখন উদরস্থ করিতে শিখিয়াছে! ধর্ম্মের কথাটা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম,—কেহ হিন্দুয়ানি মানুন আর না মানুন, তাহাতে হিন্দুধর্ম্মের মোটেই আসিয়া যাইতেছে না, কিন্তু এ কথাটি আমরা জোর করিয়া বলিব,—এই বাজারের খাবার হইতে দেশে অম্ল-অজীর্ণ-অগ্নিমান্দ্য বা ডিসপেপ্সিয়া রোগ বাঙ্গালায় সংক্রামিত হইয়া পড়িতেছে। সকল বিষয়ের মত খাদ্যেও এখন ভেজালের চলন যথেষ্ট চলিয়াছে। ঘৃত এবং ময়দায় কিরূপ ভেজাল চলিয়া আসিতেছে, তাহা সংবাদপত্র-পাঠকগণের

অবিদিত নাই। দোকানদার লাভ করিতে বসিয়া, খুব দেখিয়া শুনিয়া, বিশেষ বিবেচনাসহ উৎকৃষ্ট ঘৃত এবং ময়দার আমদানি পূর্ব্বক যে খাগ্য প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিবে—এমন কথা ত তাহাকে মাথার দিব্য দিয়া দেওয়া নাই; সুতরাং তাহার দোকানের খাগ্যে বাঙ্গালা দেশ অজীর্ণ-প্রবণ হইবে কি না; তাহা তাহার চিন্তা করিবার ও আবশ্যক নাই। দেশের লোকে এ কথা বুঝেন না—ইহাই দুঃখ। আমাদের মনে হয়, সেকালে পল্লীগ্রামে যে মুড়ি-চালভাজা, আদা ছোলা, গুড়-চিনির ব্যবস্থা ছিল;—এখনকার বাজারের কচুরি-শিঙ্গাড়া তুলিয়া দিয়া, সকলে যদি জলযোগের সময় সেইরূপ ব্যবস্থা পুনঃ প্রচলিত করেন, তাহা হইলে, দেশ হইতে অম্ল-অজীর্ণ-রোগীর সংখ্যা অনেক কমিয়া যাইতে পারে। দেশের লোকে এ সকল বুঝিবেন কি?

* * * *

পানীয়ে প্রমাদ—আহারের মত অযথা পানীয়-ব্যবহারে ও বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য ক্ষয় হইতেছে। প্রাণধারণের জন্য আহার্য্যের মত পানীয়েরও প্রয়োজন; কিন্তু সে পানীয়ের ব্যবহার উপযুক্ত হওয়া কর্ত্তব্য। চা'য়ের দোকানের মত কলিকাতায় এখন সোডা-লেমনেডের দোকানও অসংখ্য। সকালে-সন্ধ্যায় চা-পান এবং দ্বিপ্রহরে সোডা-লেমনেডের আস্বাদন অনেক বাঙ্গালীই এখন করিয়া থাকেন। ডিস্পেপ্সিয়া বা অম্ল-অজীর্ণ-অগ্নিমান্দ্যের রোগীদিগের নিকট ইহার ব্যবহার ত খুব বেশীরূপই। ফলে সোডা-লেমনেডের প্রধান উপাদান ক্ষার দ্রব্যের ব্যবহারে তাঁহাদিগের আশু কষ্ট দূরীভূত হইলেও, উহারই ফলে, তাঁহাদিগের ব্যাধি কিন্তু শরীর-মধ্যে বেশ পাকিয়া দাঁড়াইতেছে। ক্ষার-দ্রব্য-ব্যবহারে অম্ল-রোগের আশু-যন্ত্রণা নিবারিত হয়, কিন্তু অম্লরোগীর পক্ষে অধিক পরিমাণে ক্ষার মিশ্রিত দ্রব্য ব্যবহার অবিধেয়—ইহা অভিজ্ঞ চিকিৎসকদিগের অভিমত। তা' ছাড়া, অধিক জলপানে অম্ল-অজীর্ণ এবং অগ্নিমান্দ্যের সৃষ্টি ইচ্ছা পূর্ব্বক আনয়ন করা হয়। ফলে, সুস্থ-শরীরে গ্রীষ্ম-সন্তাপ-নিবারণের জন্য ঐ সকল দ্রব্যের অত্যধিক ব্যবহারে অনেকে অজীর্ণ-প্রবণ হইয়া পড়িতেছেন। সেকালে গ্রীষ্ম-সন্তাপ অপোদনার্থ ডাব-বেলের সরবৎ-মিছরির পানা প্রভৃতি যে সকল পানীয়ের ব্যবস্থা ছিল, তদ্দারা বায়ু-পিত্ত-কফের সকল দোষ নষ্ট হইয়া, শারীরিক স্নিগ্ধতা লাভ ঘটিত। এখনকার সোডা-লেমনেড-পায়ীগণ যদি এ সকল কথা বুঝেন, তাহা হইলে একদিকে অর্থের অযথা ব্যয়ের হস্ত হইতে তাঁহারা ত নিষ্কৃতিলাভ করিবেনই, সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যের ও উন্নতি লাভে যে যথেষ্ট সমর্থ হইবেন, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

* * * *

আলোকে অপকার।—এখনকার আলোকের কথা তুলিলে, সাধারণতঃ কেরোসিন তৈলের আলোক বুঝাইয়া থাকে। যাঁহাদিগের অর্থ আছে, সঙ্গতি আছে, ইচ্ছা আছে, প্রবৃত্তি আছে, তাঁহারা বৈদ্যুতিক-আলোকের ব্যবস্থাপূর্ব্বক নৈশ-অন্ধকার অপনোদন করিয়া থাকেন, কিন্তু সাধারণতঃ গৃহস্থ-সংসারে কেরোসিন তৈলের আলোকেই নিশার আঁধার দূরীভূত করা হয়। এই কেরোসিন তৈলের যে গ্যাস বহির্গত হয়, তাহা কিন্তু আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকারী। শয্যাকক্ষ, বৈঠকখানা এবং অন্যান্য ঘরগুলিতে এই

কেরোসিনের আলোক চিম্‌নির দ্বারা যে প্রণালীতে ব্যবহার করা হয়, তদ্দারা বড় বেশী অনিষ্ট না হইলেও রন্ধন ঘরে চিম্‌নিবিহীন শুধু 'ডিবা' বা 'কুপি'র আলোকে যে স্বাস্থ্য-হানি অবশ্যম্ভাবী, তাহা আদৌ অস্বীকার করিবার যো নাই। আমাদের মনে হয়, যে সকল কারণে আমাদের অন্তঃপুরচারিণী মহিলাদিগের স্বাস্থ্যের অপচয় ঘটিতেছে, ইহাও তাহার মধ্যে একটি বিশেষ কারণ। পূর্ব্বে রেড়ি বা সর্ষপ তৈলে আমাদের আলোকের কার্য্য সিদ্ধ হইত, এখন সে ব্যবস্থা দেশ হইতে একেবারে লোপ পাইয়াছে। ইহার উপর, এখনকার দিনে সমস্ত রাত্রি আলো-জ্বালিয়া অনেকের নিদ্রা যাওয়া অভ্যাস আছে। দরজা-জানালাগুলিও অনেকে শয্যা গ্রহণের পূর্ব্বে বন্ধ করিয়া থাকেন। এরূপ অবস্থায় রুদ্ধ-গৃহে কেরোসিন তৈলের আলোকে যে বিষবৎ অনিষ্ট উৎপন্ন হয়, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। যদি কেরোসিনের আলোকেই সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়, তাহা হইলে অন্ততঃ রন্ধন-গৃহে 'কুপি' বা 'ডিবা'র ব্যবহার বন্ধ করাত কর্ত্তব্যই, নিদ্রার পূর্ব্বেও ওরূপ আলো জ্বালিয়া রাখা কর্ত্তব্য নহে। অধ্যয়নশীল ছাত্রগণও যদি অধ্যয়ন-কালে কেরোসিনের আলোক পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের প্রভূত মঙ্গল-সাধিত হইবে।

* * * *

আবরণে অমঙ্গল।—সেকালে দৈহিক আবরণ বা জামার ব্যবহারটা অনেকে যেরূপ অল্প পরিমাণে করিতেন, এখন সেইরূপ তাহার সর্ব্বদা প্রচলন চলিয়াছে। ভূমিষ্ঠ-কালের পর হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত—সকল অবস্থাতেই সকল সময়ে জামার ব্যবহার না করিলে কাহারও যেন অঙ্গরক্ষা—তথা ভদ্রতা-রক্ষা হয় না,—ইহা এখন দেশের আপামর সাধারণের বদ্ধমূল-ধারণা জন্মিয়াছে। শ্লেষ্মা-প্রধান শিশু-শরীরে এই জামার ব্যবহার সর্ব্বদা করিলে, তাহাদিগের স্বাস্থ্যহানির ততটা কারণ না ঘটিলেও ইহা দ্বারা বয়স্থ ব্যক্তিদিগের স্বাস্থ্যোন্নতির যে বিশেষ বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে, ইহা সুনিশ্চিত। সর্ব্বদা জামা গায়ে দিয়া, দেহ আচ্ছাদিত করিয়া রাখিলে, দেহ মধ্যে বায়ু-চলাচলের অন্তরায় ঘটিয়া থাকে। আমাদের পরিত্যক্ত-পল্লীভূমির অনাচ্ছাদিত-দেহ কৃষিজীবি বা শ্রমজীবি সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্য এই-জন্যই আমরা অনেক সময় সমুন্নত দেখিতে পাই। আমরা স্বাস্থ্যসুখ-প্রয়াসী দেশবাসী-দিগকে এ কথাটিও চিন্তা করিতে পরামর্শ প্রদান-করিতেছি। কর্ম্ম-কাল হইতে অবসর লইয়া অন্ততঃ স্বীয় গৃহে অবস্থিতি কালেও অনাচ্ছাদিত-দেহে সেকালের সভ্যতাবিহীন ব্যক্তিদিগের পন্থা অনুসরণ করিলেও যথেষ্ট পরিমাণে স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটিতে পারিবে।

* * * *

যানারোহনের অপকারিতা-দেশে যখন রেল-ষ্টিমারের চলন হয় নাই,—তখন লোকে পঞ্চাশ মাইলেরও দূরবর্ত্তী স্থান হইলে পদব্রজে যাতায়াত করিত। এখন রেল-ষ্টীমারের প্রবর্ত্তনে বালি-দমদমা হইতেও ত কেহ পদব্রজে যাতায়াত করিবে না,—কলিকাতার মধ্যেও ট্রাম-লাইনে এক পল্লী হইতে অন্য পল্লীতে যাতায়াত করিতে হইলে, ট্রাম ভিন্ন কাহারও গমনাগমনের উপায় নাই। শরীর রক্ষার জন্য চেষ্টা করিয়া, যত্ন লইয়া, ব্যায়ামকার্য্য ত লোকে ভুলিয়াই গিয়াছে, গমনাগমনের

প্রয়োজনে—হেলায়-শ্রদ্ধায় পদব্রজে যে ব্যায়ামটুকু হইতে পারে, ক্রমশঃ লোকে তাহাতেও অনভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। সুখ-সুবিধার জন্য মোটর-ট্রাম-অশ্বযান প্রভৃতি যানারোহনের প্রয়োজন হইলেও সাধারণ লোকের পক্ষে সিমলা হইতে হেদুয়ার মোড় পর্য্যন্ত যাইতে অবশ্য ট্রামের প্রয়োজন হওয়া উচিত নহে। ইহাতে একদিকে যেরূপ বিলাসিতার প্রশ্রয় দেওয়া হইতেছে, অপর দিকে সেইরূপ এই অকর্ম্মণ্যতার ফলে বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যেরও অপচয় ঘটিতেছে। পাঁচ পয়সা, ছয় পয়সা করিয়া, মাসের শেষে অনেকগুলি পয়সাও এজন্য ব্যয়িত হইয়া যাইতেছে। যাহা হউক, দেশের আবহাওয়া যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ-জীবন প্রকৃতই অন্ধকারময়। শুধু কলেজের সর্ব্বোচ্চ ডিগ্রি লাভ করিয়া, রাশি রাশি অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিলে চলিবে না, স্বাস্থ্য-সুখলাভের জন্য সর্ব্বাগ্রে চেষ্টাশীল হইতে হইবে। আমাদের আশা-ভরসাস্থল প্রত্যেক বাঙ্গালী-সন্তান এ সকল কথা বুঝুন,—বুঝিয়া স্বাস্থ্যসুখ লাভের জন্য সর্ব্বপ্রথম চেষ্টা করুন—ইহাই আমরা দেখিতে ইচ্ছা করি।

কবিরাজ—শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত।

অনুকরণে আমাদের অবস্থা।

—:*:—

আমরা এখন ‘ঘ’রের বা’র হইয়াছি। সে কালের যে সকল পদ্ধতি আমাদের সর্ব্ব বিষয়ের উপযোগী বলিয়া বিধিবদ্ধ ছিল, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ যেরূপ নিয়মে সংসার-যাত্রার সকল প্রকার কর্ম্ম অবহিত চিত্তে নির্ব্বাহ করিতেন, বৃন্দারকদলের অবতারকল্প, লোকহিতবৎসল, স্বার্থত্যাগী, ঋষিমণ্ডলী বহুল-গবেষণার ফলে যে সকল বিষয় আমাদের করণীয় বলিয়া শাস্ত্র নামে অভিহিত করিয়াছিলেন, কাল-মাহাত্ম্যে, পাশ্চাত্য শিক্ষায় প্রণোদিত হইয়া, সে সমস্তই এখন আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। আমরা হিন্দু নামে অভিহিত, কিন্তু হিন্দুজনোচিত সকল প্রকার করণীয়ই আমরা করিতে জানি না, বাঙ্গালী বলিয়া আমরা পরিচয় দিয়া থাকি, কিন্তু বাঙ্গালীর অনেকগুলি আচরণই মানিয়া চলিতে এখন আমাদের লজ্জাবোধ হয়, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের প্রাচীন-পন্থা অনুকরণ করিতে এখন আমরা যেন সর্ব্বতোভাবে কুণ্ঠিত হইয়া থাকি। অপর দিকে পাশ্চাত্য শিক্ষায়, পাশ্চাত্য-সমাজের অনুকরণ-প্রয়াস এখন আমাদের সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনীয় হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু সে অনুকরণেও আমরা সাফল্য-লাভ করিতে পারিতেছি না।

কথাটা আর একটু খুলিয়া বলা আবশ্যক। পাশ্চাত্য-সমাজে প্রাতঃসন্ধ্যায় ‘চা’ পানের ব্যবস্থা আছে, আমাদের সে অনুকরণটা করিতেই হইবে, কিন্তু পাশ্চাত্য-সমাজে কিছু আহার না করিয়া ‘চা’ পানের ব্যবস্থা নাই, আমরা কিন্তু তাহার অনুকরণ করিতে শিখিব না, শুধু চা পানের

ব্যবস্থা করিলেই সভ্য সমাজের অনুকরণ সুসিদ্ধ হইল! ইহাই হইয়াছে আমাদের অবস্থা! কিন্তু এবম্বিধ অবস্থার ফলে হিন্দু—তথা বাঙ্গালী-সমাজের যে বিলক্ষণ ক্ষতি হইতেছে, আমরা তাহা চিন্তা করিবারও অবসর পর্য্যন্ত পাইতেছি না, ইহাপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? শুধু একটা চায়ের কথা মাত্র উল্লেখ করিলাম; বলিলে এরূপ ভূরি ভূরি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। আমরা অন্যান্য কথার আলোচনা না করিয়া, অদ্য শুধু ব্যায়ামের কথা অবলম্বনে অনুকরণে আমাদের অবস্থা বা আমাদের ক্ষতি-বৃদ্ধির কথা বুঝাইব।

কলির পরমায়ু একশত কুড়ি বৎসর শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট, কিন্তু এখন অনেকের আয়ু-সূর্য্য পঞ্চাশৎ বৎসরের পূর্ব্বেই অস্তমিত হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন জীবিত-কালের অধিকাংশ সময়ই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বা আরোগ্য অবলম্বনে অতিবাহিত করিতেছেন, অধুনা এরূপ ভাগ্যবান ব্যক্তিরও দর্শন অত্যল্প ঘটিয়া থাকে। সে কালের লোকে সভ্য কি অসভ্য ছিলেন, ভদ্রতা অর্থাৎ এ কালের মার্জ্জিত-ভদ্রতা বা 'eticate' দোরস্তে তাঁহারা অভ্যস্ত ছিলেন, কি না, ছিলেন, সে কথা লইয়া আমরা কোন আলোচনা করিতে চাহিনা, কিন্তু ইহা বলিলে বোধ হয় অসঙ্গতি দোষ ঘটিবে না, যে, সে কালের লোকে ঋষি-প্রবর্ত্তিত-পন্থানুসরণে জীবণের সমস্ত ভাগই যেরূপ নিরোগ-দেহে অতিবাহন করিতে সমর্থ হইতেন, আমরা সেই মহাজন পন্থা বা ঋষি-প্রদর্শিত সরণী-ভ্রষ্ট হইয়া, সমস্ত জীবন অতিবাহিত করা ত দূরের কথা, বৎসরের দশমাংশ সময়ও ক্ষেপণ করিতে সমর্থ হইতেছি না। ইহা ভিন্ন সে কালের হিসাব-গণনায় দীর্ঘজীবি ব্যক্তির সংখ্যা যেরূপ ভূরি ভূরি পাওয়া যাইত, এ কালে অল্প-জীবির সংখ্যাই সেইরূপ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে। এ অবস্থায় সে কালের আদর্শ অবলম্বনই আমাদের পক্ষে হিতজনক ছিল, কি অনুকরণে আমাদের শ্রেয়ঃ লাভ ঘটিতেছে বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেরই ইহা চিন্তা করা উচিত।

সে কালের লোকে অতি প্রত্যূষেই গাত্রোত্থান করিতেন। গাত্রোত্থান করিয়া, মলত্যাগ ও দন্ত-ধাবনাদি কার্য্য সমাপনান্তর দৈনন্দিন অন্যান্য কর্ম্মের মত দৈহিক লঘুতা-সম্পাদনার্থ, কর্ম্ম-সামর্থ্য-পরিবর্দ্ধনার্থ, অঙ্গ সৌষ্টব দৃঢ়ীকরণার্থ, বায়ু পিত্ত-কফ—ত্রি ধাতুর দোষ নিবারণার্থ—যাহাতে অগ্নি-বৃদ্ধি হয়, দেহ-শিথিল্য নিবারিত হয়, জরা ও নানা প্রকার জটিল-ব্যাধি যাহাতে অকালে আক্রমণ করিতে না পারে—তাহার উপায় বিধান করিবার জন্য—নিয়ম পূর্ব্বক কিছুক্ষণ ব্যায়াম কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। সে ব্যায়াম-কার্য্য কাহার কুস্তির দ্বারা সম্পন্ন হইত, কাহার বা ভ্রমণে সুসিদ্ধ হইত। ফল কথা, দৈনন্দিন স্নান এবং পান-ভোজনের মত নিয়ম পূর্ব্বক ব্যায়াম করিতে হইবে,—ইহা সে কালে অনেকেই মনে করিতেন।

এত গেল, সাধারণ কথা। সাধারণ লোকে এইরূপ ভাবে সে কালে ব্যায়াম-কার্য্য সুসিদ্ধ করিত। কিন্তু ধর্ম্মবৎসল, নিষ্ঠাবান হিন্দুজাতির শ্রেষ্ঠ জাতি—দ্বিজমণ্ডলীর ব্যায়াম-কার্য্য কুস্তি এবং ভ্রমণাদি ব্যতিরেকেও যেরূপ ভাবে নির্ব্বাহিত হইত, তাহার আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে, সংযম-নিয়মপরায়ন, ব্রহ্মজ্ঞান-পরিপূর্ণ, তপোদীপ্ত-দেহ, প্রকৃতি

পুঞ্জের হিতাকাঙ্ক্ষী আমাদের আর্য্য ঋষি মণ্ডলী আমাদের জপ-তপ, আহ্নিক-পূজার নিয়ম প্রবর্ত্তনে, তাহার ভিতর দিয়াও সু-কৌশলে এবং অলক্ষিত ভাবে ব্যায়াম-কার্য্য সিদ্ধ করিবার জন্য কি এক অপূর্ব্ব ব্যবস্থারই না বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতির কুস্তি বা মল্ল-ক্রীড়ায় সময় ক্ষেপণ করিলে চলিবে না; দেশ-রক্ষার জন্য, সমাজ-বন্ধন অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, কুশল-কল্যাণ-চিন্তা-প্রসূত-উপদেশ-বর্ষণে সমগ্র মানবজাতির শুভাশুভ বিষয়ের ব্যবস্থা করিবার জন্য, ব্রাহ্মণ-বৈশ্য প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ জাতির লোক-দিগকে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিতে হইবে এই জন্য,—সমগ্র মানব জাতির কল্যাণেচ্ছু আর্য্য-ঋষিগণ তাঁহাদিগের ধর্ম্ম-কর্ম্মের ভিতর দিয়াও যাহাতে তাঁহাদের স্বাস্থ্য অব্যাহত থাকে, যাহাতে তাঁহারা নীরোগ দেহে দীর্ঘায়ু লাভ করিতে সমর্থ হন, ধর্ম্মের সহিত ব্যায়ামের কার্য্য সম্পন্ন হওয়ায় জরা-বার্দ্ধক্য যাহাতে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে না পারে,—ইহার জন্য,—তাঁহাদিগের পূজা-আহ্নিকে, তাঁহাদের ভগবদুপাসনায়, তাঁহাদের পার-লৌকিক ইষ্ট চিন্তার মধ্যে "প্রাণায়ামে"র ব্যবস্থা করিয়া কি অলৌকিক শক্তিরই না পরিচয় প্রদান করিয়াছেন! মানবজাতির দেহরক্ষার জন্য তাঁহাদের সেই অপূর্ব্ব উদ্ভাবনী-শক্তি স্মরণ করিলে চমৎকৃত না হইয়া থাকিতে পারা যায় না।

প্রকৃত পক্ষে ব্যায়াম কার্য্যের মহদুদ্দেশ্য প্রাণায়াম দ্বারা যেরূপ সুসিদ্ধ হইয়া থাকে, সেরূপ আর কিছুতেই হইতে পারে না। শাস্ত্রকার বলিয়া গিয়াছেন,—

ব্যায়াম দৃঢ় গাত্রস্য ব্যাধির্নাস্তি কদাচন।
বিরুদ্ধং বা বিদগ্ধং বা ভুক্তং শীঘ্রং বিপচ্যতে॥

অর্থাৎ ব্যায়ামের দ্বারা গাত্রের দৃঢ়তা লাভ ত হইয়া থাকেই, কোন ব্যাধিও ব্যায়মশীলের শরীরে প্রবেশলাভ করিতে পারে না। বিরুদ্ধ বা বিদগ্ধ দ্রব্য সকলও ব্যায়ামশীল ব্যক্তি ভোজন করিলে অনায়াসেই জীর্ণ করিতে সমর্থ হন।

এখন কথা হইতেছে, এতগুলি কার্য্য ব্যায়ামের দ্বারা কেমন করিয়া সিদ্ধ হয় এবং সে কালের প্রাণায়াম-পরায়ণ ব্যক্তিগণ কেমন করিয়া সেই সকল কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করিতেন, এখন আমরা তাহারই আলোচনা করিব।

শরীর রক্ষার জন্য দেহীগণের শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি অব্যাহত রাখা যে একান্ত প্রয়োজন, একথা লইয়া বোধ হয় কোনও বাদানুবাদই উঠিবার সম্ভাবনা নাই। এই শ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য্য আমাদের হৃৎকোষ্ঠ সংস্থিষ্ট ফুস্ফুস হইতে সম্পাদিত হইতেছে। শাস্ত্রকার বলিয়া গিয়াছেন—শরীর মধ্যে করোটি, বক্ষঃ ও উদর—এই তিনটি গুহা বা গহ্বর বর্ত্তমান আছে। ইহার মধ্যে করোটিতে মস্তিষ্ক, বক্ষপ্রদেশে উণ্ডুক, ফুস্ফুস ও হৃৎকোষ্ঠ এবং উদর প্রদেশে পিত্তাশয়, আমাশয়, ক্লোম, ধমনী, স্কন্ধ, ক্ষুদ্রান্ত্র, স্থূলান্ত্র, প্লীহা, বৃক্কদ্বয়, মূত্রনাড়ী, বস্তি ও স্থূলান্ত্রের নিম্নাংশ বর্ত্তমান থাকে। আমরা এই তিনটী গুহার শ্রেণী-বিভাগ করিয়া, ইহাদিগকে ঊর্দ্ধ, মধ্য এবং নিম্ন-গুহা অধিধানে অভিহিত করিয়া লইতেছি। ঊর্দ্ধ এবং নিম্ন গুহার বিষয় এস্থলে আলোচনা করিবার আবশ্যক নাই। শ্বাস-প্রশ্বাসের বিষয় বুঝিবার জন্য মধ্যগুহা বা বক্ষের বিষয় লইয়া আলোচনা করিলেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

এই গুহার সম্মুখভাগে উরোহস্থি, পর্শুকো-পাস্থি ও পর্শুকাগণ অবস্থিতি করিতেছে। পার্শ্বদ্বয়েও পর্শুকাগণ ও পশ্চাদভাগে কশেরুকা সকল, উপরিভাগে প্রথম-পর্শুকা ও উর্দ্ধপট্ট এবং নিম্নভাগে বক্ষঃস্থল পেশী বর্ত্তমান। এই গুহাতেই হৃৎকোষ্ঠ, উণ্ডূক ও ফুস্‌ফুসের স্থান নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে।

হৃৎকোষ্ঠ বক্ষ প্রদেশের মধ্যস্থলে তির্য্যগ-ভাবে একটি আবরণী দ্বারা আবৃত রহিয়াছে। ইহার উপরিভাগেই ফুস্‌ফুসের স্থান। হৃৎকোষ্ঠই বিশুদ্ধ রক্তের আধার এবং ইহা হইতেই ধমনী উত্থিত হইয়াছে। ইহারই উর্দ্ধ ও নিম্নপ্রদেশে দুই দুইটি করিয়া চারিটি গর্ভ-প্রকোষ্ঠ বিদ্যমান। শারীর-যন্ত্রের যাবতীয় শিরা একত্রীভূত হইয়া, দুইটি মহাশিরা রূপে পরিণত হইয়াছে এবং ঐ শিরাদ্বয় উর্দ্ধস্থ দক্ষিণ হৃদ্‌গর্ভে সমাগত হইয়া শরীরের সর্ব্বপ্রকার দূষিত রক্তকে তথায় অর্পণ করিতেছে। অধঃস্থ বামগর্ভ হইতে মূল ধমনী উদ্গত হইয়াছে। দূষিত রক্ত এই গর্ভ চতুষ্টয়ে উপস্থিত হইয়া, বিশুদ্ধতা লাভ পূর্ব্বক প্রাণীগণকে জীবিত রাখিতেছে। জীবের ভূমিষ্ঠকাল হইতে মরণ-কাল পর্য্যন্ত হৃৎকোষ্ঠ একবার স্ফীত ও একবার সঙ্কুচিত হইতেছে,—এমনইভাবে দেহীগণের দেহ-রক্ষার জন্য বিধাতা সৃষ্টি-নৈপুণ্যের অপূর্ব্ব ব্যবস্থা করিয়াছেন। হৃৎপিণ্ডের আকুঞ্চন-প্রসারণ ক্ষণমাত্র নিবৃত্ত হইলেই মৃত্যুসংঘটিত হইবে—ইহাও বিধাতার অপূর্ব্ব নিয়ম বন্ধনী।

যাহা হউক, যেরূপ মধুচক্র বা মৌচাকে কোষ থাকে সেইরূপ ফুস্‌ফুসের মধ্যে যে অসংখ্য কোষ বিদ্যমান রহিয়াছে, উহারই ভিতর শ্বাসাকৃষ্ট বায়ু রক্তনালীর মধ্যে শ্বাসক্রিয়া সম্পাদনান্তর সঞ্জীবনী শক্তি আনয়ন পূর্ব্বক আমাদের জীবনী শক্তি বহন করিতেছে।

কথাটা আর একটু খুলিয়া বলা যাউক। শ্বাস-ক্রিয়া দ্বারা বাহ্যবায়ু নাসিকা ও মুখরন্ধ্র দিয়া শ্বাস নাড়ীতে প্রবেশ পূর্ব্বক ফুস্‌ফুসের অসংখ্য কোষমধ্যে উপস্থিত হইতেছে। যে দুইটি মহাশিরা যাবতীয় শিরা-সম্মিলনে উদ্ভূত হইয়া, দেহ মধ্যস্থ দূষিত রক্ত সকলকে হৃদ্‌-গর্ভে সমাগত করিতেছে, তাহাদেরই দ্বারা আনীত রক্ত হৃদ্‌গর্ভ হইতে ফুস্‌ফুসে উপস্থিত হইতেছে। শ্বাসাকৃষ্ট বায়ুর সাহায্যে এই রক্তই বিশুদ্ধ, সুখোষ্ণ ও লোহিতবর্ণ হইয়া হৃৎকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইতেছে এবং তথা হইতে ধমনীমার্গে অতি প্রবলভাবে সমুদয় দেহ পরিভ্রমণ করিতেছে।

যাহা হউক বুঝা গেল, দেহ রক্ষার জন্য, বল-সঞ্চয়ের জন্য, শ্বাসক্রিয়া দেহী-মাত্রেরই একান্ত প্রয়োজন। কথা বলিতে, পথ চলিতে, বা নাসা ও মুখবিবর হইতে শ্বাস-প্রশ্বাস ত্যাগ করিতে, যে পরিমাণ শ্বাস-ক্রিয়া দেহী-শরীরে সম্পন্ন হয়, শরীর ধারণের জন্য তাহা যথেষ্ট নহে। এই জন্যই ব্যায়ামের প্রয়োজন। প্রাণায়ামে এই শ্বাস-ক্রিয়ার কার্য্য যেরূপ সুসিদ্ধ হয়, তাহা কুস্তি, মুগুর-ভাঁজা বা জিম্‌-নাষ্টিক অপেক্ষা পরিমাণে অল্প ত নহেই, পরন্তু সে ব্যায়ামে শ্বাস ক্রিয়ার কার্য্য আরও অধিক পরিমাণে সিদ্ধ হইয়া থাকে। সনাতন আর্য্য-জাতির প্রাচীন ইতিহাস অণুশীলন করিলে, এই জন্যই সেকালের তপঃ নিষ্ঠ ঋষিদিগের পরমায়ু সহস্র সহস্র বৎসর নির্দ্দিষ্ট ছিল দেখিতে পাইয়া থাকি। মহাভারতের ভীষ্মদেব এই জন্যই ইচ্ছা মৃত্যুর অধিকারী হইয়াছিলেন।

অমিততেজা দ্রোণাচার্য্যের বীরত্ব এই জন্যই বুঝি অতুলনীয় বলিয়া পরিগণিত ছিল। ব্রাহ্মণ কৃপাচার্য্য-অশ্বত্থামার অব্যাহত শক্তিও এইজন্য বুঝি অদ্যাপি অমানুষিক বলিয়া ঘোষিত হইয়া আসিতেছে।

যাক্ সে কথা,—এখন আমরা শূর-বীর হইতে চাহি না, অমিততেজা-যোদ্ধৃবৃন্দেরও আসন-পরিগ্রহে আমাদের আশক্তি নাই। আমরা চাহি, এখনকার দিনে মোটা-ভাত, মোটা-কাপড়ের সংস্থান করিয়া, মোটামুটি চালে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া, আরোগ্য এবং দীর্ঘজীবন লাভ পূর্ব্বক, জীবিতকালের সকল সময় টুকু সাচ্ছন্দ্য লইয়া কাটাইতে পারি,—মাত্র ইহাই এখনকার দিনে আমাদের লক্ষ্যস্থল,—সেই লক্ষ্যস্থল হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছি বলিয়াই ব্যায়ামের কথা—তথা সেকালের প্রাণায়ামের কথা স্মৃতিপথে যেন কেমনই জাগরিত হইয়া পড়িতেছে। এই জন্যই এত কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি।

শুধু 'প্রাণায়ামে'র কথা কেন, সেকালে আমরা সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার জন্য যে সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিতাম, সে সকলের মধ্যেই প্রচ্ছন্নভাবে ব্যায়াম-কার্য্যের কতকটা যেন নিহিত থাকিত। বেদপারগ-ব্রাহ্মণগণ, প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া, প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তর "গঙ্গাগঙ্গেতি যো ব্রুয়াৎ যোজনানাং শতৈরপি" বলিতে বলিতে যে গঙ্গাস্নান (বা যে দেশ ভাগীরথি-সুলভ নহে—সেখানে গ্রাম-সান্নিধ্য নদী বা দীর্ঘিকাসলিলে) প্রাতরবগাহন মানসে গমন করিতেন, তদ্দারা পথভ্রমণে তাঁহাদের ব্যায়ামের কার্য্য কতকটা সিদ্ধ হইত। তাহার পর, পূজোপচার-সংগ্রহের জন্য প্রভাতানিল-প্রবাহিত, পুষ্প-বাটিকার প্রস্ফুটিত-পুষ্পগুচ্ছ-চয়নে তাঁহাদের যে ভ্রমণ টুকু করিতে হইত, তাহারও ফলে কতকটা ব্যায়ামের কার্য্য সিদ্ধ হইয়া যাইত। তাহার পর, আহ্নিক-কালে প্রাণায়ামে'র কথা ত বলিয়াছি-ই। কেবল ব্রাহ্মণের কথা কেন, সকল জাতির মধ্যেই সেকালে সংসার যাত্রা পরিচালন-কার্য্য-ব্যপদেশে, সকলেরই হেলায়-শ্রদ্ধায় ব্যায়ামের কার্য্য কতকটা সম্পন্ন হইত। এখনকার মত সেকালে সার্ট-কোর্ট গায়ে দিয়া, লম্বা কোচা ঝুলাইয়া, কেশ-গুচ্ছের পারিপাট্য সাধন করিয়া, অপরিণত বয়সে এবং নিষ্প্রয়োজনে উপচক্ষু দ্বারা চক্ষুর সম্পদ বর্দ্ধন করিয়া, 'বাবুগিরি'র জন্য কেহ ব্যস্ত হইত না। দরিদ্র-মহৎ, ইতর-ভদ্র, শুদ্র-ব্রাহ্মণ সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই 'স্বাবলম্বন' বলিয়া সেকালে একটা জিনিষ সকলেই মানিয়া চলিত। তাহারই ফলে, স্নান-কার্য্য সমাপনান্তর বস্ত্র প্রক্ষালনের জন্য এ কালের মত সেকালের লোকে দাস-দাসীর অপেক্ষা করিতেন না, উদরপূর্ত্তির উপায়-বিধানের জন্য বিপণি-স্থানে যাইতে লজ্জা বোধ করিতেননা, বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়-স্বজনের সুখদর্শন-মানসে এখনকার মত সামান্য মাত্র পথটুকু চলিবার জন্যও তাঁহাদের ট্রাম-অশ্বযান বা মোটর প্রভৃতির প্রয়োজন হইত না।

ইহা ভিন্ন, সেকালে যে জাতীয়-বৃত্তির ব্যবস্থা দেশমধ্যে অক্ষুন্ন ছিল, তাহার ভিতর দিয়াও সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যায়ামের ব্যবস্থা কেমন অলক্ষিতভাবে নিষ্পন্ন হইত। দ্বিজাতিগণের কথা তো বলিয়াছি-ই, দ্বিজাতিদিগের মধ্যে 'বৈদ্য' চিকিৎসা-ব্যবসায় ভিন্ন অন্যবিধ কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন না। রোগী দেখিবার জন্য সেই চিকিৎসা ব্যবসায়ী

বৈদ্যগণ স্বগ্রামে পদব্রজে রোগি-সন্দর্শনে গমন করিতেন। ঔষধ প্রস্তুতের ব্যবস্থাও একালের মত সেকালে লোকজন দিয়া করাইবার বন্দোবস্ত ছিল না, সে কালের বৈদ্যগণ নিজেরাই সে সকল সম্পন্ন করিতেন। কাজেই তাঁহাদিগের জীবিকা-নির্ব্বাহের বৃত্তির মধ্যেই ব্যায়াম-কার্য্য সিদ্ধ হইত।

কেবল ব্রাহ্মণ-বৈদ্য কেন, সকল জাতির মধ্যেই সেকালে এইরূপে হেলায়-শ্রদ্ধায় কতকটা ব্যায়াম-কার্য্য হইয়া যাইত। কর্ম্মকার, কুম্ভকার, মোদক, নরসুন্দর, গোপ, মালি, তিলি, তাম্বুলী এবং অন্যান্য জাতির সকলেই যে সকল নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি লইয়া, সেকালে জীবিকা-নির্ব্বাহের ব্যবস্থা করিতেন, তাহারই ফলে, তাহারই মধ্য দিয়া, তাঁহাদের ব্যায়াম-ক্রিয়া সম্পন্ন হইত। আমাদের আর্য্য-ঋষিমণ্ডলী গবেষণার ফলে সকল বিষয় চিন্তাপূর্ব্বক এই জন্যই আমাদের ধর্ম্মপালন এবং করণীয় সম্পন্নের ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। প্রত্যেক জাতির আশ্রমধর্ম্ম যে সকল কারণে তাঁহারা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, একটু স্থির চিত্তে ভাবিয়া দেখিলে, স্পষ্টই প্রতীতি হইবে, যে, আমাদের স্বাস্থ্য যাহাতে অব্যাহত থাকে, আমরা নীরোগ ও সুস্থদেহে যাহাতে দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারি,—আমাদের উদরান্নের সংস্থানের সহিত, শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিচালন ক্রিয়ার যাহাতে অন্তরায় উপস্থিত হইতে না পারে,—সকল কারণ অপেক্ষা আমাদের করণীয়-নির্দ্ধারণের ইহাই তাঁহাদের মুখ্যতম উদ্দেশ্য ছিল। অধুনা আমরা সে উদ্দেশ্য ভুলিয়াছি, উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া, সমাজ-রক্ষার একমাত্র নিয়ন্তা—ব্রাহ্মণজাতিকে একদেশদর্শী বলিয়া অভ্যস্ত হইয়াছি, কলেজের সর্ব্বোচ্চ ডিগ্রিলাভের জন্য জীবিতকালের প্রায় অর্দ্ধাংশ অতিবাহিত পূর্ব্বক চিরকাঙ্ক্ষিত-চাকরিগত-প্রাণ সকল জাতির মধ্যেই একাকারের সৃষ্টি আনিয়া ফেলিয়াছি,—সুতরাং কে কাহার কথা শুনিবে? ব্রাহ্মণ-শূদ্র,—সকলই এক পন্থার পথিক হইয়াছে, কেহ কাহাকে বুঝাইবার নাই। এখন আমরা এমনই কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছি যে, সহস্র-উপদেশ-বর্ষণেও বুঝি আমাদের আর উদ্ধারের উপায় নাই, এই পতিত জাতির নিকট কেহ সুপথ দেখাইয়া দিলেও বুঝি সে আর তাহা অবলম্বন করিতে সমর্থ নহে।

দেশের পুরুষগুলির ত দুর্গতি এইরূপই দাঁড়াইয়াছে। সাক্ষাৎ দেবী-প্রতিম-রমণী-জাতির দুর্গতিও ইহাপেক্ষা কম হয় নাই। পুরুষের মত তাঁহাদিগেরও ব্যায়াম বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিচালন-ক্রিয়ার যথেষ্ট প্রয়োজন। সে কালে তাঁহাদিগের জন্য গৃহস্থলীর কর্ম্ম সকল যাহা বিধিবদ্ধ ছিল, তাহাতেই তাঁহাদের সেই ব্যায়ামের কার্য্য সম্পন্ন হইত। ইদানীন্তন কালে একটু অবস্থাপন্ন-সংসার মাত্রেই দাস-দাসী এবং পাচক নিয়োগের ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইয়াছে। দাস-দাসীতে সম্মার্জ্জনীর পরিচালন ক্রিয়া হইতে তাম্বূল রচনা, শয্যা-সংস্কার,—সকল কার্য্য সম্পন্ন করিবে। পাচক, পাক কার্য্যে নিযুক্ত রহিবে—ইহাই অনেক সংসারে আধুনিক ব্যবস্থা! সুন্দরী-সমাজে অনেকে এখন সৌন্দর্য্য নষ্টের আশঙ্কা করিয়া, অপত্যদিগকেও স্তন্য দান করিতে চাহেন না! লজ্জাজড়িত-বিনম্র-বধূ পাছে শয্যাত্যাগের পর লোক-সন্দর্শনে সঙ্কুচিত হইতে হয়,—এই ভয়ে অতি

প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া গৃহস্থলীর বিবিধ কর্ম্মে যে আহিতা হইতেন, সে প্রথাও এখন তিরোহিত হইয়াছে। সকল বিষয়ের মত তরুণী-বধূ বা যুবতী-কন্যাও সেকালের ন্যায় স্বামি সুখ-মিলনে এখন আর সরমজড়িত নহেন! ইহার জন্য অবশ্য আমি সুন্দরী দিগকে দোষী করিতেছিনা, দোষী ইহার জন্য দেশের 'সুন্দর'গণ। 'সুন্দর'গণ, সুন্দরীদিগকে স্বকীয় স্রোতে ভাসমানা করিয়া, তাঁহা-দিগের এবম্বিধ অবস্থা উপস্থিত করিয়াছেন। সে ছড়া-ঝাঁট দেওয়া,—সে আলিপনা দেওয়া,—সে দেবগৃহ পরিষ্কার কার্য্য,—সে রন্ধন, সে পরিবেশন, সে শ্বশ্রূ-শ্বশুর, স্বামী, দেবর, পুত্র, কন্যা, অনাহুত-রবাহুত, অতিথি-অভ্যাগত,—সকলকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইয়া, সর্ব্বশেষে অবশিষ্ট মাত্র ভোজনে পরিতুষ্টা হওয়া,—তাহার পর, থালা-বাসন পরিষ্কার, ছিন্ন-বস্ত্র কন্থা-সেলাই, বৈকালে আবার কক্ষ-পরিষ্কার, শয্যা-পরি-ষ্কার; পুনরায় নৈশ-রন্ধন—প্রভৃতি কোন কার্য্যেই অধুনা আর বঙ্গরমণী অভ্যস্তা নহেন। এখন তাঁহাদের বেলা ৯টার সময় শয্যা-ত্যাগ করিতে হইবে, শয্যা হইতে উঠিয়াই পুরুষ-দিগের মত চা পান করিতে হইবে, তাহার পর শুধু উদরপূর্ত্তির ব্যবস্থা, আর নভেল-পাঠের ব্যবস্থা! একালের এই আলস্যপরতন্ত্রতার ফলেই সুন্দরীগণ যে হিষ্টিরিয়া এবং ডিস্‌-পেপ্‌সিয়া জর্জ্জরিতা, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। প্রসব কালেও এই জন্যই অনেকে প্রসব-বাধা সহ্য করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন। দেশে বলিষ্ঠ এবং স্বাস্থ্যবান্ শিশুরও এইজন্য অভাব হইতেছে। এককথায়, কি পুরুষ, কি রমণী,—সকলেই সাবেক-পদ্ধতি ভুলিয়া, অনুকরণে অবস্থার দুর্গতি করিয়া তুলিয়াছেন। ফল কথা, একালে সুখ-সুবিধান্বেষী পুরুষ এবং রমণীমণ্ডলী আলস্য-পরতন্ত্র হইয়া, অঙ্গ চালনায় যে অনভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তাহা যে আমাদের স্বাস্থ্যোন্নতির পক্ষে সম্যক্ প্রকারে বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছে, তাহাতে আর দ্বিধা করিবার কিছুই নাই।

এই স্থলে আমাদের প্রাতস্মরণীয় স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়সংসৃষ্ট একটা কাহিনীর উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। কিম্বদন্তী,—একদা বিদ্যাসাগর মহাশয় কোন একটী ষ্টেসন-সান্নিধ্যে বিচরণ করিতেছিলেন। হ্যাট-কোট পরিধৃত, সাহেবি পোষাকে মণ্ডিত একটী বাবু একটী ব্যাগ হস্তে সেই সময় ব্যাগটি লইয়া যাইবার জন্য একটী বাহক অন্বেষণ করিতেছিলেন; অদূরে অনাচ্ছাদিত-দেহ-শিখাধারী বিদ্যাসাগর মহাশয়কে মুটিয়া বা বাহক-জ্ঞানে তাঁহাকে ব্যাগগ্রহণে আদেশ প্রদান করিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও বিনাবাক্যব্যয়ে ব্যাগটি গ্রহণান্তর স্কন্ধ দেশে সংস্থাপন পূর্ব্বক গন্তব্যস্থানে পঁহুছাইয়া দিলেন। ব্যাগের অধিকারী তদীয় শ্রমের বিনিময়ে অর্থদানে উদ্যোগী হইয়াছেন,—এমন সময় ব্যাগের অধিকারীর পরিচিত একজন ভদ্রলোক তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"সর্ব্বনাশ, আপনি করিয়াছেন কি? ইনি যে দেশ-প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর!" ব্যাগের অধিকারী এইকথা শুনিয়া মরমে মরিয়া গিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট ক্ষমার ভিখারী হইলেন। দয়াপ্রবণ মহাত্মা বিদ্যাসাগর ইতিপূর্ব্বেই ত তাঁহাকে ক্ষমা করিয়াছিলেন। নতুবা তাঁহার ব্যাগবহন করিবেন কেন?

তিনি বলিলেন, "আমি তোমার ব্যাগ লইয়া আসিয়াছি বলিয়া, ক্ষমা প্রার্থনার কোন কারণ নাই, কিন্তু তুমি যে এই সামান্য মাত্র ব্যাগটি আনিবার জন্য অযথা অর্থের অপব্যয় এবং আলস্য-পরতন্ত্রতার পরিচয় দিয়াছ, ইহার জন্য ভগবদুদ্দেশে ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। বাপু, তোমাদের এবম্বিধ অকর্ম্মণ্যতার ফলেই দেশের দুর্গতি আরম্ভ হইয়াছে।"

বাস্তবিক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সেই উক্তি আজি ভবিষ্যদ্বাণীর মত সমগ্র বাঙ্গালা দেশ প্রতিধ্বনিত করিতেছে। পাশ্চাত্য শিক্ষায় অনুপ্রাণিত-বাঙ্গালী এখন আর কোন কর্ম্মেই নিজের পায়ে ভর দিয়া চলিতে সক্ষম নহে। স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম-জড়িত কি সনাতন ধর্ম্ম—কি করণীয় বিষয়—সে কালের তাবৎ কর্ম্মেই বাঙ্গালী এখন বিপথ-গামী হইয়া, দুর্গতির এরূপ সর্ব্ব নিম্নস্তরে পতিত হইয়াছে, যে, তাহার পুনরুদ্ধার সুদূর পরাহত বলিয়া মনে হয়। সেই ত সব আছে,—বাঙ্গালা দেশে সেই মার্ত্তণ্ড-ময়ূখমালা বাঙ্গালার সকল স্থান টুকু অধিকার পূর্ব্বক বাঙ্গালী জাতিকে কর্ম্ম-কুশল করিতে চেষ্টা করিতেছে,—সেই হিমকুন্দ-মৃণালাভ-শান্তকরুণ-স্নিগ্ধোজ্জল হৃদয়োন্মাদী হিমাংশু-কিরণ-সম্ভারে বাঙ্গালা দেশ আজিও ত স্বর্গীয় সুধা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতেছে,—সেই মধুর মলয়-অভিষিক্ত প্রাণোন্মত্ত বিমল আনন্দ-বহ সুস্নিগ্ধ-অনিল-ব্যজনে বঙ্গবাসীর হৃদয় তন্ত্রী ত আজিও মাতিয়া উঠিতেছে,—আমাদের পরিতুষ্টির জন্য—আমাদের আনন্দ-বিধানের জন্য—কর্ম্ম-বিজড়িত বাঙ্গালীর দেহ সুগন্ধ প্রদানে ক্ষণকালের জন্যও বিভোর রাখিবার জন্য, অলিকুলসঙ্কুল-কুসুম বাটিকায় আজিও ত অসংখ্য পুষ্পস্তবক প্রস্ফুটিত হইতেছে,—সেই বসন্ত বহিতেছে,—সেই গ্রীষ্ম ছুটিতেছে,—সেই বরষার প্লাবনে পৃথিবী প্লাবিত হইতেছে, সেই সুখদ-শরতে জগজ্জননী-শারদ-প্রতিমার অর্চ্চনা হইতেছে,—হিম প্রবণ হেমন্ত ঋতুতে সেই ত বিশ্ব সংসার হিমাঙ্গ বিকম্পিত হইয়া পড়িতেছে। সবই হইতেছে, সবই চলিতেছে—সেকালে যেমনটি, ছিল, প্রকৃতিরাণী সেকালে যেরূপ সজ্জা-সম্ভারে সৌন্দর্য্য প্রদর্শনে দিগ্বধূগণের আনন্দ উৎপাদন করিতেন,—এখন ত তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই? তবে আমাদের অবস্থা এরূপ হইল কেন? আমরা সেকালের স্বাস্থ্য বিজড়িত ধর্ম্ম-কর্ম্ম ভুলিয়া আজি এরূপ অধঃপতিত হইয়া পড়িলাম কেন! ইহার বিষয় চিন্তা করিলে, বুক ফাটিয়া উঠে। হে সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবন্, তুমি এই কর্ম্মফলে-পতিত-অধঃপতিত সমাজকে উদ্ধার কর। তুমি ভিন্ন আর আমাদের গতি নাই। হে অনাথের নাথ, হে বিপদ্ভঞ্জন, দরিদ্রের সম্বল, মধুসূদন, এ অবস্থার শোচনীয় সময়ে তুমিই আমাদের একমাত্র ভরসাস্থল।

আমার আর একটি কথা বলিবার আছে। এই কথাটি বলিলেই অদ্য আমার বক্তব্যের পরিসমাপ্তি হইবে। ব্যায়াম, স্বাস্থ্যরক্ষার মূল,—ব্যায়াম বিহীন ব্যক্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিচালনার অভাব হইলে, তাহার জীবনী-শক্তি-বর্দ্ধনের উপায় থাকিবে না,—ইহা যেমন সেকালের সমাজ-তত্ত্বজ্ঞ ঋষিমণ্ডলী চিন্তা করিতেন, একালেও দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় সে চিন্তায় বিরত নহেন। এই জন্যই অধুনা সমস্ত স্কুল-কলেজে 'ড্রিলে'র ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইয়াছে। প্রত্যেক বিদ্যালয়েই ড্রিল শিক্ষা দিবার জন্য একজন করিয়া ড্রিল-শিক্ষক

নিযুক্ত আছেন। কিন্তু সে শিক্ষার মূলে এমন একটা গলদ রহিয়াছে, যে, সে শিক্ষায় আমাদের ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টই অধিক হইতেছে। কারণ, আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান-দেশবাসীর ব্যায়ামের ব্যবস্থা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের উপযোগী করিয়াই সেকালে বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। পাশ্চাত্য জাতির নির্দ্দিষ্ট ব্যায়ামকালে আমাদের ব্যায়ামকাল নির্দ্দেশ করিলে, আমাদের স্বাস্থ্যোন্নতির সম্ভাবনা নাই। স্কুল-কলেজে এই ব্যায়ামের সময় কিন্তু বেলা দ্বিপ্রহরের পর তৃতীয় প্রহরেই নির্দ্দিষ্ট। এ সময় ব্যায়াম করিলে আমাদের স্বাস্থ্যোন্নতি ত হইতেই পারে না, স্বাস্থ্যের পক্ষে এ সময় যথেষ্ট অপকারী বলিয়াই শাস্ত্রকারগণ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। শাস্ত্রকার বলিয়াছেন,—

"ভুক্তবান্ কৃতসম্ভোগঃ কাসী-শ্বাসী কৃশক্ষয়ী।
রক্তপিত্তী-ক্ষতী-শোষী ন তং কুর্য্যাৎ কদাচন॥

অর্থাৎ—আহারের পর, মৈথুনের পর, কৃশ ব্যক্তির পক্ষে এবং কাস, শ্বাস, ক্ষয়, রক্তপিত্ত, ক্ষত ও ধাতুশোষ—এই সকল রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে ব্যায়াম সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ।

এই অবাস্থ্য স্কুল-কলেজের অধ্যয়নশীল ছাত্রদিগের জন্য যে ব্যায়ামকাল নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, তাহা শাস্ত্র বিগর্হিত। আমাদের বাঙ্গালী শিশুর পক্ষে ঐ সময় ব্যায়াম-নির্দ্দিষ্টকাল হইতে পারে না। শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ এ সম্বন্ধে চিন্তা করেন—এজন্য আমরা তাঁহাদিগের করুণ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

ফল কথা,—দেশ বাসীর মতিগতি যদি আবার পরিবর্ত্তিত হয়, সর্ব্ববিষয়ে অনুকরণের প্রথা যদি আবার আমরা ছাড়িয়া দিয়া, সাবেক পন্থায় চলিতে চেষ্টা করি, আমাদের ধর্ম্ম—আমাদের করণীয় বিষয়,—গর্ব্বভরে—মর্ম্মে মর্ম্মে—আবার যদি আমরা উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করি,—দেশ রক্ষার জন্য, সমাজ বন্ধনী অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, আমাদের আয়ুষ্কালের সমস্তটুকু অপ্রতিহতভাবে অব্যাহত রাখিবার জন্য,—আমাদের কুশল-কল্যাণেচ্ছু-ত্রিকালদর্শী আর্য্যঋষি প্রবর্ত্তিত—সরণী-অন্বেষণে আবার যদি আমরা প্রয়াস-পরায়ণ হইতে পারি, তাহা হইলে পৃথক্ ব্যায়ামকাল নির্দ্দেশ করিয়া, শরীর-রক্ষার জন্য আমাদের কোন প্রয়োজনই হইবে না,—স্বাস্থ্য-বিজড়িত ধর্ম্ম-কর্ম্ম করিলেই আমাদের কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারিবে। দেশের পুরুষমণ্ডলী দাসদাসীর এতাদৃশ মুখাপেক্ষী না হইয়া কর্ম্মণ্য হউন,—সুকুমারমতি শিশুজীবনের প্রবৃত্তির অঙ্কুর-কালেই তাঁহাদিগকে কর্ম্মণ্য করিবার চেষ্টা করুন,—যৌবনে সেই কর্ম্মস্রোত অপ্রতিহতগতি লইয়া যাহাতে সমস্ত জীবনব্যাপী হইতে পারে,—তাহার জন্য চেষ্টাপর হউন,—স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে আর কোন অন্তরায়ই থাকিবে না। দেশের রমণীগুলিকেও আবার কর্ম্মকুশলা করিতে হইবে। তাঁহাদিগকে আলস্য-অবসন্নতা হইতে উদ্ধার করিয়া, তাঁহাদিগের হস্ত হইতে নাটক-নভেল কাড়িয়া লইয়া, বিলাস-ব্যসনে তদ্গত প্রাণা—তাঁহাদিগের চিত্ত বৃত্তির গতির বৈপরীত্য সাধন করিয়া, তাঁহাদিগের কুসুম-কোমল-প্রাণে অরুন্ধতী-কুন্তী-দ্রৌপদী বা বঙ্কিম চরিত্রের অপূর্ব্ব চিত্র—শ্রী-সূর্য্যমুখী-ভ্রমর, অথবা রাজপুতমহিলা সংযুক্ত-কর্ম্মদেবীর কর্ম্মণ্য বিষয়ের জ্ঞাতব্য কথাগুলি অঙ্কিত করিয়া দিতে হইবে। স্বভাব সুলভ বিলাস-বাঞ্ছা,—প্রকৃতিরাণীর সর্ব্বসৌন্দর্য্যের অধিকারিণী,—ইহসংসারে প্রজাসৃষ্টির এক মাত্র সাহায্যকারিণী—দেশের মহিলাদিগকে বলিতে হইবে,—"মা লক্ষ্মীগণ, আমাদের এই

অধঃপতিত জাতির পুনরুদ্ধারের জন্য তোমরা আমাদের সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য-পরায়ণা হও। —তোমরা ত চিরদিনই স্বার্থত্যাগ করিতে জান, আমাদের ছাড়িয়া, তোমাদের স্বাতন্ত্র্য ত কোনকালেই নাই।—আমরাই তোমাদিগকে একদা কর্ম্মকুশলা ভাবে গঠন করিয়া, সমাজ রক্ষার সুব্যবস্থা করিয়াছিলাম, আবার আমরাই এখন তোমাদিগের রুচি-বিপর্য্যয় ঘটাইয়া, তোমাদিগকে নির্জ্জীব-অচেতন পদার্থের মত সজ্জিত করিয়া—সমাজ শৃঙ্খলা নষ্ট করিতে বসিয়াছি। যাহা হউক, যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, আর আমরা বিপথগামী হইব না—লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া, কর্ত্তব্যচ্যুত হইয়া, আমাদের স্বাস্থ্যের দুর্গতি যতদূর হইতে পারে, তাহা ত হইয়াছেই, কাণের ভিতর দিয়া মরমে মরমে কে যেন এখন আমাদিগকে আবার সেই কথা বলিয়া দিতেছে—

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্ম বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎস্বনুষ্ঠিতাৎ
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ো পরোধর্ম্মে ভয়াবহঃ।

সে ধ্বনি শুনিয়া; আরোগ্যলাভের জন্য, স্বাস্থ্যসুখ অব্যাহত রাখিবার জন্য, দীর্ঘজীবন লাভ করিবার জন্য, ঐকান্তিকমনে আবার আমরা স্ব স্ব ধর্ম্ম মানিয়া চলিব ইচ্ছা করিয়াছি।—স্ব স্ব ধর্ম্ম মানিয়া ঋষিপ্রবর্ত্তিত কর্ম্ম পরায়ণ হইব স্থির করিয়াছি,—জপতপ-পূজা আহ্নিক—সর্ব্বাপেক্ষা প্রাণায়ামের ব্যবস্থা নিয়মপূর্ব্বক পালন করিব, অভীপ্সা করিয়াছি,—তোমরা ত আমাদের সকল কর্ম্মের চির সাহায্য-কারিণী। তোমাদের দয়া—তোমাদের স্নেহ, তোমাদের অনুরাগস্পৃহা স্মরণ করিয়াই ত কবি তোমাদের কত গুণ-গান গাহিয়াছেন। সেইজন্য তোমাদের নিকট প্রার্থনা করিতেছি,—তোমরা আমাদের যেমন ছিলে, তেমনি হও—আমাদের জীবনাধিষ্ঠাত্রী-তোমরা, এস তোমাদের লইয়া আমরা সাবেক পদ্ধতি অবলম্বনে শ্রেয়ো-লাভের চেষ্টা করি।

কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত।

শিশুর ক্রিমি চিকিৎসা।

(মহিলাগণের বিশেষ পাঠ্য।)

(ঠাকুর মা ও লীলা)।

লী। ছেলেগুলো ক্রিমিতে বড় কষ্ট পাচ্চে ঠাক্‌মা, তাই এলাম।

ঠা। কা'র্ কা'র্ ক্রিমি হয়েছে ?

লী। বড় খুকি, ছোট খোকা আর বড় খোকা—তিন জনেরই হয়েছে, ঠাক্‌মা।

ঠা। কি ক'রে বুঝ্‌লি যে ক্রিমি হয়েছে ?

লী। মলের সঙ্গে প'ড়েছিল যে! বড় খোকা ও ছোট খোকার পেট থেকে দু'দিন দু'টো কেঁচোর মত বেরিয়েছে। আর বড় খুকির মলের সঙ্গে সুতোর মত শাদা-শাদা ছোট ছোট ক্রিমি প্রায় রোজই পড়ে।

ঠা। বাঃ, একেবারে মাধব-নিদান দেখছি!

লী। মাধব নিদান কি ঠাক্‌মা ?

ঠা। তা'র মানে, যত রকম ক্রিমি নিদানে লেখা আছে,—সব রকমই হ'য়েছে।

লী। কেন, এই দুইরকম ছাড়া আর ক্রিমি নেই ?

ঠা। আছে বৈ কি। আমি কথার কথা বলছি। তবে আমাদের দেশে সাধারণতঃ পেটের ক্রিমি এই দুই রকমই দেখা যায়।

লী। পেটে ছাড়া অন্য কোন জায়গায় ক্রিমি হয় নাকি, ঠাকমা ?

ঠা। হয় বৈকি। ছোট ছোট পোকা শরীরে আশ্রয় করে, দেখিস্‌নি! তারাও ক্রিমি জা'ন্‌বি। নিকি-উকুন—এরাও একরকম ক্রিমি। ক্রিমি, রক্তের মধ্যে ঢুকে কুষ্ঠরোগ পর্য্যন্ত জন্মাবার কারণ হয়। মাথায় যে টাক হয়, তারও মূল ক্রিমি জেন। তা সে সব কথা যাক্, এখন আজ এই দুই রকম ক্রিমির কথাই বল্‌বো। কিন্তু আমি ভাব্‌ছি যে, তুই এত সাবধানী মেয়ে, তোর ছেলেদের ক্রিমি হ'ল কি ক'রে।

লী। ভাল কথা ঠাকমা, ক্রিমি কেন হয় বলত ?

ঠা। ওই যে কেঁচোর মত ক্রিমি, ওগুলো যা'র পেটে হয়, তা'র পেট থেকে অসংখ্য ক্রিমির ডিম মলের সঙ্গে বেরোয়। সেই মল কোন রকমে জলে মিশে গেলে, সেই জলে অনেক ক্রিমির ডিম থাকে। আর সেই জল যে খায়, তা'র পেটে সেই ডিম যায়। জল না খেয়ে, সেই জলে শাক-সব্জী, কি ফল যা' কাঁচা খাওয়া যায়,—সেই সব ধুয়ে খেলেও তার সঙ্গে ক্রিমির ডিম পেটে যায়। আর পেটে গিয়ে সেই সব ডিম ফুটে ক্রিমি হয়। তারাও আবার অনেক ডিম পাড়ে।

লী। আর সুতো-ক্রিমি কি রকম ক'রে অন্যের শরীরে যায়, ঠাক্‌মা ?

ঠা। সুতো-ক্রিমিও প্রায় এই রকম ক'রেই যায়। তবে সুতো-ক্রিমির ডিম জলে ডুবে থাকলে বেশীক্ষণ বাঁচে না। ফল-ফুলুরি আর শাক-সব্জীর সঙ্গেই এই ক্রিমির ডিম পেটে যায়। এই ক্রিমি-রোগীর মলমিশান ধোয়াটে জল শাক-সব্জীতে লাগ্‌লে, তা'তে ও ক্রিমির ডিম লেগে যেতে পারে। তা' ছাড়া এই রোগে মল-দ্বারের চুল্‌কানি হয়। রোগী মলদ্বার চুলকালে তার নখের ভিতর কি আঙ্গুলে ডিম লেগে যায়। আর সে সেই হাতে যদি কোন খাবার জিনিষ দেয়, তা' হ'লে তা'র সঙ্গে ক্রিমির ডিম মিশে যেতে পারে।

লী। আচ্ছা ঠাক্‌মা, এই ক্রিমিগুলো থাকে কোথায় ?

ঠা। কেঁচোর মত ক্রিমিগুলো প্রায় নাড়ীতেই (অন্ত্র বা Intestine) থাকে। তবে অনেক যায়গায় এমন কি গলা পর্য্যন্ত যেতে পারে। আর সুতোর মত ক্রিমি গুলোর আড্ডা মলভাণ্ড, (Rectum)। তবে মুখ দিয়ে এসে তাদের ডিম ফোটে ব'লে নাড়ীর মধ্যেও তা'দের দেখা যায়। ক্রিমির বিকার জন্যে অনেক উৎকট রোগ হ'তে পারে লীলা।

লী। আচ্ছা ঠাক্‌মা, এক সঙ্গে কত গুলো ক্রিমি থাকে আর তাদের ডিমই বা কত হয় ঠাক্‌মা!

ঠা। কেঁচো-ক্রিমি গুলো একসঙ্গে প্রায় ২৫।৩০টে ক'রে থাকে। আর সুতো ক্রিমি ২০০।৫০০—এরও বেশী থাকে। ডিম হয় এদের মেলা—তা'সংখ্যা করা যায় না।

লী। দেখ ঠাক্‌মা, এইবার তোমার চুরি

ধরা পড়েছে। আমি নিদানের বাঙ্গালা প'ড়ে দেখেছি, তা'তে এসব কথা কিছু নেই। এ সব তোমার কবিরাজী নয়, চুরি করা ডাক্তারী বিদ্যে।

ঠা। লীলা, সত্যিই এসব ডাক্তারী কথা। কিন্তু কবিরাজীতে যে এ সব নেই, তা' নয়। আছে বড় গোপন ভাবে, সকলে বুঝতে পারে না। এই বিষয় নিয়ে লোকনাথ বদ্দির সঙ্গে কল্‌কাতার সেই বিজ্ঞ ডাক্তার বাবুটির যে সব কথা হয়েছিল, তা' শুনে, আমি অনেক শিখেছি, সে সব শাস্ত্রের কথা।

লী। ধন্যি তুমি ঠাকমা, মেয়ে মানুষ হ'য়ে, কি ক'রে এত শাস্ত্রের কথা শিখ্‌লে?

ঠা। তোকে কতবার মনে ক'রে দেব, যে, মেয়ে মানুষও মানুষ, তা'রা জন্তু জানোয়ার কি গাছ-পালা কিছু নয়। এ সব কথায় বেটা-ছেলের যতটা দরকার, মেয়ে-মানুষের ততটা বা তারও বেশী দরকার জান্‌বি। প্রাচীনকালে অনেক লেখাপড়া জানা (বিদুষী বা পণ্ডিত) মেয়েমানুষ ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। আর এখন অনেক মেয়েমানুষ ডাক্তারী ক'রছে, বই লিখ্‌ছে, রাণীগিরি ক'রে রাজ্য চালাচ্ছে,—এওত দেখ্‌তে পাই। মেয়েমানুষ কম কিসে?

লী। ঠিক ব'লেছ ঠাকমা, আমি অতটা ভাবিনি। আর এখন আমাদের দেশের মেয়েমানুষের যে অবস্থা হ'য়েচে, তা'তে তা'দের আঁতুড় ঘর আর রান্নাঘরের বিষয় শেখা ছাড়া অন্য কিছু শেখ্‌বার দরকার আছে ব'লে যেন মনেই হয় না।

ঠা। লীলা কথাটা ঠিক বলেছিস্। সংসারে থাক্‌তে হ'লে, পুরুষকে আর মেয়েমানুষকে নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম ক'রতে হ'বে। সেই হিসাবেই মেয়েমানুষ আঁতুড়ঘর, রান্নাঘর আর গৃহস্থালী নিয়ে থাকে। কিন্তু মেয়েমানুষের যদি সকল দিকে হিসাব জ্ঞান না থাকে, তা'হলে সংসারের সুবন্দোবস্ত হ'তেই পারে না। পুরুষ মানুষ,—এনেই খালাস্। সেই আনা-জিনিষ ভাগ-বাটোয়ারা ক'রে দেওয়া আরও শক্ত, এই জন্যেই মেয়ে মানুষের সব বিষয়ে জ্ঞান থাকা দরকার।

লী। তা' ঠাকমা, আমরা কিন্তু এত শক্ত কাজ করি, তবু আমাদের দেশের পুরুষেরা আমাদের পায়ের তলায় ফেলে রেখেছে। কিন্তু সাহেবেরা মেয়েদের কত মান্য করে।

ঠা। আঃ পাগ্‌লী, সেটা সম্পূর্ণ ভুল। আমরা যখন পুরুষের মা, তখন তা'রা বলে, জননী আর জন্মভূমি স্বর্গের চেয়ে বড়। আমরা যখন তাদের স্ত্রী, তা'রা আমাদের ছেড়ে কোন কাজ ক'রতে পারে না। তাই রামচন্দ্র যজ্ঞ করবার সময় সোণার সীতা তৈরি ক'রে যজ্ঞ ক'রেছিলেন। পুরুষ মানুষ বলে, যে,—স্ত্রী আর লক্ষ্মীতে কোন প্রভেদ নাই, এটা কি শোননি? আবার দেখ, আমরা যখন মেয়ে বা কন্যা হই, তখন আমরা পিতার স্নেহ মমতা যা' পাই, তা আর কোন দেশে আছে ব'লে আমার মনে হয় না।

লীলা। আজ আমার একটা মস্ত ভুল ভেঙ্গে দিলে ঠাকমা। আমি ভাবতাম, সাহেবদের দেশে মেয়েমানুষের বেশী মান, কিন্তু এখন বুঝ্‌ছি, সেটা মস্ত ভুল। ওদের ভালবাসা বা সম্মান করা অন্তঃসার শূন্য, তবে বাইরে বড় চক্‌চকে। আর আমাদের বাইরে চাকচিক্য না থাকলেও ভিতরে বড় সার আছে।

ঠা। বুঝেছিস্—সেও ভাল। নইলে হয়ত নাতজামাইকে কোন দিন এস্তোপা (Divorce) করতিস্। তা' সে কথা যাক্, এখন যে জন্যে এয়েচিস্, সে কথা বল্।

লীলা তোমার পায়ে পড়ি ঠাকুমা, লোকনাথ বদ্দি আর সেই ডাক্তার বাবুর সঙ্গে কি কথা হ'য়েছিল—বল।

ঠা। সে অনেক কথা, তবে মোটামুটি বলি শোন্। ডাক্তারে আর কবিরাজে ক্রিমি নিয়ে কথা হয়। তার পর ডাক্তার বাবু, আমি আগে যে সব কথা বলিছি, সেই সব কথা ব'লে, বললেন, "দেখুন কবিরাজ মশায়, এ সব কথা যখন আপনাদের শাস্ত্রে নেই, তখন এগুলো আপনাদের শাস্ত্রমধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া উচিত।"

লী। কবিরাজ মশায় কি বললেন?

ঠা। কবিরাজ মশায় বললেন,—তার জন্যে আপনাকে ব্যস্ত হ'তে হ'বে না,—রাজার জাতের অনেক জিনিষ বিজিত জাতির মধ্যে প্রবেশ করে—তা' কি ভাষায়, কি পরিচ্ছদে, কি খাদ্যে আর কি ঔষধে। মুসলমান রাজার আমলে আমরা জমি-জমার বন্দোবস্ত কর্‌তাম, গায়ে মেরজাই পর্‌তাম, মাংসের কাবাব খেতাম্, মোরব্বা ব'লে ওষুদও তৈয়ের কর্‌তে শিখেছিলাম। ইংরেজের আমলে আমরা গেলাসে জল খাই, গায়ে কোট পরি, বিস্কুট-পাঁউরুটী, চপ-কটলেট খেতে শিখেছি, আর কুইনাইন সালসার ত ছড়াছড়ি! সুতরাং ডাক্তারীর অনেক জিনিষ কবিরাজীর মধ্যে প্রবেশ ক'রেছে এবং করবে। তবে ক্রিমির বিষয় যা' আপনি বললেন, সেটা আমাদের শাস্ত্রে একেবারে নেই, তা' মনে করবেন্ না।

লী। ডাক্তার বাবু কি বল্‌লেন?

ঠা। ডাক্তার বাবু একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্লেন,—"বলেন কি! এসব আপনাদের শাস্ত্রে আছে?" তখন কবিরাজ মশায় খুলে বল্লেন, দেখুন, আপনি বিজ্ঞ ব্যক্তি। আপনি জানেন, যে, ফর্ম্মা পূরণ ক'রবার জন্যে আপনাদের অনেক পুস্তক লেখা, আয়ুর্ব্বেদে কিন্তু সে বিষয় দু একটী কথায় বুঝিয়ে দেওয়া হ'য়েছে। এই দেখুন, ক্রিমির উৎপত্তির কারণ "মলিনাশন" একটী। মলিনাশন কিনা—ময়লামিশ্রিত জল আর খাদ্য। আরও দেখুন, আমাশয় আর পক্বাশয়ের মধ্যে ক্রিমির "প্রসব" হয় লেখা আছে। প্রসব মানে উৎপত্তি হ'তে পারে, কিন্তু কেবল উৎপত্তি বোঝাবার জন্যে প্রসব শব্দ আয়ুর্ব্বেদের কোথায়ও প্রয়োগ করা হয়নি। সুতরাং এ শব্দপ্রয়োগে শাস্ত্রকারের বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। সে উদ্দেশ্য হ'চ্ছে—ক্রিমির প্রসব করে এটা, বোঝান। আর ক্রিমির বাচ্ছা হয় না,—ডিমই হয়—এটা জীব-জগতের দিকে লক্ষ্য ক'র্‌লে, আমরা স্পষ্টই বুঝতে পারি। তা' হ'লে ক্রিমির ডিমও পাওয়া গেল, আর সেই ডিম সংযুক্ত জল বা খাদ্যই মলিনাশন।

লী। ডাক্তার বাবু কি বল্‌লেন?

ঠা। তিনি বল্‌লেন, তা' অসঙ্গত নয়, তবে বড় অস্পষ্ট,—কষ্ট ক'রে বুঝতে হয়। আর ক্রিমির অন্যান্য কারণ ত লেখা রয়েছে। তখন কবিরাজ মশায় বল্লেন, কারণ এক রকম নয়, অনেক রকম। ঘট ত'য়ের কর্‌বার কারণ—মাটী আর কুমারের চাক, কিন্তু কুমার সবই। ঐ সব খাদ্য খেলে ক্রিমিরা খুব বাড়্‌তে পায় সে জন্যে ওগুলোও কারণের মধ্যে।

লী। ডাক্তার বাবু তা'র কি উত্তর করলেন?

ঠা। ডাক্তার বাবু বল্লেন, তা' যেন হল, কিন্তু ক্রিমি রোগ যা'তে না জন্মাতে পারে, তা'র জন্যেও ত সবকথা গুলো খুলে বলা উচিত ছিল। কবিরাজ ম'শায় বল্লেন,—অনাবশ্যক কথা বলা শাস্ত্রকারদের স্বভাব নয়। একেত জল আর খাদ্য সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদ যেরূপ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার উপদেশ দিয়েছেন, তা'তেই কার্য্যসিদ্ধ হ'য়েছে,—তা'র উপর ধর্ম্মশাস্ত্র ব'লেছেন,—জল নারায়ণ, জলে কোন রকম মল মিশ্রিত করা নিষিদ্ধ। আর খাদ্য ও জল সম্বন্ধে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কথাও ধর্ম্মশাস্ত্রে অনেক র'য়েছে। তবুও আবার আয়ুর্ব্বেদ সাবধান করে দিয়েছেন যে, ক্রিমি ও অণ্ড দূষিত জল খাবে না।

লী। ডাক্তার বাবু তা' শুনে কি ব'ল্লেন?

ঠা। ডাক্তার বাবু বল্লেন,—হাঁ একরকম বুঝ্লাম, তবে স্পষ্ট নয়। তখন কবিরাজ ম'শায় একটু হেসে বল্লেন,—এখন আমাদের সমস্তই অস্পষ্ট ম'শায়। জানিনে ভগবান্ আবার কবে সুস্পষ্ট করবেন। যাই হ'ক এ সুযোগে একটা বিষয় আপনাকে দেখাই। এই দেখুন কতপ্রকার অদৃশ্য ক্রিমির কথা র'য়েছে। অদৃশ্য জিনিষ যখন তাঁরা দেখ্তে পেতেন, তখন হয় অনুবীক্ষণ যন্ত্র ছিল, নয় তাঁদের অতীন্দ্রিয় বিষয়ের জ্ঞান ছিল। আর আজকাল যে জীবাণু নিয়ে আপনারা ক্ষেপে উঠেছেন, সেটাও তাঁ'দের জানা ছিল।

লী। আর কিছু কথা হ'ল?

ঠা। বলবার মত আর কোন কথা হয় নি। এখন তোর কথা বল্।

লী। বলিছি ত,—খোকা দু'টির কেঁচো ক্রিমি, আর বড় খুকির ছোট ক্রিমি হ'য়েছে।

ঠা। বড় ক্রিমির প্রধান লক্ষণ নাক খোঁটা আর ঘুমিয়ে দাঁত কিড়্মিড়্ করা। তা' কিছু করে?

লী। দাঁত কিড়্মিড় খুব করে, আর নাকও খোঁটে।

ঠা। আর কি উপসর্গ আছে?

লী। কেমন ফ্যাকাশে চেহারা হ'য়েছে। ভাল খেতে পারে না, মুখ দিয়ে কেবল থুথু ওঠে, আর কেমন নির্জ্জীব হ'য়ে প'ড়েছে।

ঠা। বাহ্যে কেমন হয়?

লী। বাহ্যে ভাল হয় না। একবার ক'রে শক্ত বাহ্যে হয়।

ঠা। এখন থেকে এ রোগ ভাল না হ'লে এর পর পেটের অসুখ দাঁড়া'বে।

লী। তা'তেই ব'ল্ছি, তোমায় শীগ্গির ভাল ক'রে দিতে হবে।

ঠা। আচ্ছা তা' হবে, এখন ওষুদের কথা বলি শোন্। কমলাগুঁড়ি ব'লে এক রকম ইটের রঙ্গের ভারি গুঁড়ো বেনের দোকানে পাওয়া যায়। তাই কিনে এনে জলে ফেল্তে হবে। যে গুলো ভেসে থাকবে, তাই নিয়ে শুকিয়ে রাখ্বি।

লী। আচ্ছা জলে ফেলতে হয় কেন ঠাকুমা?

ঠা। ওর সঙ্গে অনেক ধুলো-বালি মিশান থাকে কিনা। জলে ফেল্লে ধুলো-বালি গুলো নীচে প'ড়ে যায়, আর ওষুদ গুলো ওপরে ভাসে।

লী। আচ্ছা আমি ঐরকম ক'রেই নেব।

ঠা। এই কমলাগুঁড়ি তিন রতি মাত্রায় টাট্কা ঘোলের সঙ্গে সকালে খালি পেটে খেতে

দিবি। আর শুধু কমলাগুঁড়ি না দিয়ে বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, সাচিক্ষার, হরীতকী আর কমলাগুঁড়ি সমান ভাবে নিয়ে গুঁড়ো ক'রে এক আনা কি দেড় আনা মাত্রায় হয় ঘোল, নয় ত গরম জলের সঙ্গে দিলে আরও ভাল হয়।

লী। সাচিক্ষার জিনিসটা কি আর পাবই বা কোথায়?

ঠা। সাচিক্ষার আর কিছুই নয়, সাজি-মাটি। বেণের দোকানে পাওয়া যায়।

লী। আচ্ছা আর কি ওষুদ দেব বল?

ঠা। সকালে ঐ ওষুদ দিস্, আর বিকালে পলাশ বীজ তিন রতি আর বিড়ঙ্গ তিন রতি হয় ঘোলের সঙ্গে, নয়ত জলের সঙ্গে বেটে দিস্। ক্রিমির পক্ষে বিড়ঙ্গ খুব ভাল জিনিস জান্‌বি। শুধু বিড়ঙ্গের গুঁড়া তিন রতি মাত্রায় দু'বেলা খাইয়েও ক্রিমি ভাল করা যায়।

লী। আর কি দেব?

ঠা। আর কিছু দিতে হবে না, যে সকল বল্‌লাম, ঐ সব দিলেই ভাল হ'য়ে যাবে। এর উপর একটু-একটু চুণের জল দিতে পার।

লী। আচ্ছা তবে খুকীকে কি ওষুদ দেব বল?

ঠা। সকালে খালিপেটে সোমরাজী-বীজের গুঁড়ো তিন রতি, গরম জলের সঙ্গে দিস্। আর বিকালে কেঁউ গাছের মূলের রস আধ তোলা মধুর সঙ্গে দিস্।

লী। যদি কেঁউ মূল না পাই?

ঠা। তা' হ'লে পাল্‌তেমাদারের ছালের রস কি ডালিমের শিকড়সিদ্ধ জল দিস্।

লী। এর চেয়ে সহজ কিছু নেই?

ঠা। আছে বৈ কি,—কচি আনারস পাতার রস, ঘেঁটুপাতার রস, শাঞ্চে শাকের রস—এ সমস্তই ক্রিমির ভাল ওষুদ। আর বিড়ঙ্গ যে খুব চমৎকার ওষুদ তা'ত আগেই ব'লেছি।

লী। তা'র পর পথ্যির কথা বল?

ঠা। পথ্যির কথাও ব'লছি। কিন্তু দেখ, এই যে, সুতোর মত ছোট ক্রিমি এগুলো বড় বিশ্রী। ওষুদে সহজে যেতে চায় না।

লী। ওষুদে না গেলে তবে কিসে যা'বে?

ঠা। পিচকারী ক'রে ওষুদ দিলে খুব শীগ্‌গির যায়।

লী। সে কি ঠাকুমা, কবিরাজীতে আবার পিচকারি ক'রে ওষুদ দেওয়া কি! সে ত ডাক্তারেরাই দেয়!

ঠা। তুই জানিস্‌নে, তাই বল্‌ছিস্। পিচকারী দেওয়াকে কবিরাজীতে 'বস্তি' বলে। বস্তিকে শাস্ত্রে অর্দ্ধেক চিকিৎসা ব'লেছে। ডাক্তারদের পিচকারী দেওয়া, কবিরাজী বস্তির কাছে কিছুই নয়। বস্তি যে কত রকম আছে, তা'র ঠিক নেই।

লী। কিন্তু এখন ত কোন কবিরাজকে বস্তি দিতে দেখিনি?

ঠা। তোকে কতবার বল্‌বো, যে, শাস্ত্রে যে সব চিকিৎসার কথা আছে, তার সিকির সিকিও এখন কবিরাজেরা ক'রতে জানে না। কবিরাজী মতে ক্রিমির চিকিৎসা ক'রতে হ'লে, প্রথমে রোগীকে, ঘি কি অন্য কোন স্নেহ পান করা'তে হয়। তা'র পর বমি করিয়ে, পরে জোলাপ দিতে হয়। তা'র পর বস্তি দিয়ে পরে ওষুদ দিতে হয়। এখন এসব আর কেউ করে না, কেবল খাবার ওষুদ দেয়। আর তাইতে রোগও সহজে ভাল হয় না।

লী। কি ওষুদের বস্তি দিতে হয়?

ঠা। বস্তির কথা আর সে সব ওষুদের কথা এখন ছেড়ে দাও, এখন দরকার হ'লে, ডাক্তারির সাহায্যে পিচকারি দিতে হ'বে। সাবান-ঘসা জল, কি ছোট পেঁয়াজের রস এই দু'টার একটা কিছু নিয়ে পিচকারী দিলেই হয়।

লী। সে পিচকারী দেওয়ার হাঙ্গামায় এখন কাজ নেই ঠাকুমা। ওষুদে ভাল হ'বে না?

ঠা। ভাল হ'বে না এমন কোন কথা নেই। বরং সুপথ্যি আর ওষুদ প'ড়লে ভাল হবারই কথা। তবে তা'তে ভাল না হ'লে, পিচকারী দিতে হ'বে তাই বলে রাখলাম।

লী। আচ্ছা তুমি এখন পথ্যির কথা বল।

ঠা। প্রথমে এ রোগে কি কি খেতে নেই তাই বলি। ঘি, দুধ, দই, মাষকলায়, শাক মাংস, মিষ্টি, টক, পিটে, ঠাণ্ডা জিনিষ, বেশী পাতলা জিনিষ—এ সব খেতে নেই জেনে রেখ।

লী। তা' কচিছেলে দুধ না দিলে কি ক'রে চলবে?

ঠা। না,—দুধ দিতে হবে বৈকি, তবে যা' খায় তা'র অর্দ্ধেক আন্দাজ দিবি। আর ১৫।২০টে বিড়ঙ্গ থেঁতো ক'রে, জল এক পোয়া আর দুধ এক পোয়ার সঙ্গে সিদ্ধ ক'রবি। জল ম'রে গেলে, ছেঁকে নিয়ে সেই দুধ দিবি। যদি বিস্বাদ ব'লে খেতে না চায়, তবে একটু মিছরী মিশিয়ে দিয়ে দিস্।

লী। আর কোন রকম ক'রে দুধ দেওয়া চলে না?

ঠা। কুলথি কলায়ের কাথ ক'রে তা'র সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারিস্। যতটা দুধ তা'র সিকি আন্দাজ কাথ মিশিয়ে দিতে হয়।

লী। কাথ কি নিয়মে ক'রতে হয়?

ঠা। এই মনে কর্ আধ ছটাক আন্দাজ কুলথিকলায়ের দাল নিয়ে, একসের জলে সিদ্ধ করে একপোয়া থাকতে ছেঁকে নিবি।

লী। আর কোন রকমে দুধ দেওয়া যায় না?

ঠা। যত দুধ তা'র সিকি আন্দাজ চূণের জলের সঙ্গে মিশিয়ে দিলেও চলে। তবে চূণের জলে একটু বাহ্যে কষা করে ব'লে, যা'দের পাতলা বাহ্যে হয়, কি বেশী বাহ্যে হয়, তা'দের পক্ষেই ভাল।

লী। আচ্ছা ঠাকুমা, কবিরাজীতে ত নানা রকম দুধের ব্যবস্থা আছে; তা' ক্রিমি রোগে কি কোন দুধ ভাল নয়?

ঠা। কেবল উটের দুধ ভাল। তা' সে পশ্চিমে যে দেশে উট আছে, সে দেশের লোকেই কেবল পেতে পারে। তোমরা ত তা' আর' পা'বে না।

লী। আচ্ছা দুধের কথা ত হল, কিন্তু মিষ্টি একটু না দিলে ত চলবে না।

ঠা। মিষ্টির মধ্যে মিছরী, তাও যত কম হয়, ততই ভাল।

লী। আচ্ছা আর কি কি দিতে পারি বল।

ঠা। পুরাণ দাদখানি চালের ভাত, মোচা, কাঁচকলা, উচ্ছে, করলা, পল্‌তাশাক, পটোল, বেতোশাক, নিমপাতা—তরকারীর মধ্যে এই সব সুপথ্য। তবে দু' একখানা আলু, বেগুন মধ্যে মধ্যে না দিলে চলবে না। রুটী, লুচি, পাঁউরুটী, বিস্কুট—এ সব এ রোগে মোটেই চলবে না।

লী। দাল কিছু দেওয়া যেতে পারে?

ঠা। দাল এ রোগে সুপথ্যি নয়, ঝোল-

ভাতই খেতে দিস। তবে নেহাৎ কোন দিন কারে পড়্‌লে, একটু অড়হর,—কি কুলথি কলায়ের দালের যুষ দিস।

লী। মাছ-মাংস কিছু দেওয়া যেতে পারে?

ঠা। মাংস এ রোগে একেবারেই কু-পথ্যি। মাছও সুপথ্যি নয়।

লী। কেন ঠাক্‌মা, তুমি বল্‌তে, যে, কবিরাজীতে সব রোগেই মাংসের ব্যবস্থা আছে।

ঠা। তা' আছে. কিন্তু সে মাংস কি দিতে পার্‌বি? এ রোগে ইঁদুরের মাংস সুপথ্যি।

লী। সে কি ঠাক্‌মা, ইন্দুরের মাংস কি মানুষে খায়?

ঠা। কেন খা'বেনা? মানুষের অখাদ্য কি আছে! এক দেশের লোকে না খায়,—অন্য দেশের লোকে খায়।

লী। তা থাক্‌, কিন্তু মাছ একটু-আধটু না হ'লেত ঠেকিয়ে রাখা শক্ত হ'বে।

ঠা। তা' একটু আধটু মাছ দিস্। খল্‌শে. কৈ, মাগুর, শিঙ্গি,—কি মৌরলা মাছ.—যত কম দিয়ে রাখ্‌তে পারিস্, তা'রই চেষ্টা কর্‌বি।

লী। রাত্রে কি খেতে দেব?

ঠা। রাত্রে সহ্য হলে, দু'টি ভাত দেওয়াই ভাল। তবে নেহাত যদি ভাত সহ্য না হয়, দুধ-বার্লি, কি, খৈ-দুধ দিস্। কিন্তু দুধ যেমন ক'রে ব'লেছি, তেমনি ক'রে সিদ্ধ ক'রে দিবি।

লী। জলখাবার—কি দিতে পারি?

ঠা। এ বিদ্‌কুটে রোগে পথ্যির বড় ক'ট্‌কেনা। তা' দাড়িম, পানফল, দু' চারটে, কিসমিস, আনারস আর একটু মিছরী,—এই দিস্। আনারসটা এ রোগে সুপথ্যি।

লী। দু'টি মুড়ি দিতে পারিনে?

ঠা। মুড়ি কি অন্য ভাজা-পোড়ার নাম একেবারেই ক'রনা। এ রোগে ও গুলিকে বিষ ব'লে জান্‌বে।

লী। আর কি দেওয়া যেতে পারে?

ঠা। আর কিছু নয়, যা' বল্‌লাম, তাই দিবি। আর ঠাণ্ডা জল না দিয়ে, আগে যেমন গরম জল কি গরম জল ঠাণ্ডা ক'রে দিতে ব'লিছি তাই দিবি।

(মেজ বৌয়ের প্রবেশ)

মে। এই যে ঠাকুরঝি কখন্ এলে?

লী। অনেকক্ষণ এয়েছি। এখন তোর রান্না কেমন চল্‌ছে বল্ দেখি?

মে। এখন আর রাঁধ্‌তে কষ্ট বোধ হয় না, অভ্যাস হ'য়ে গেছে।

লী। দেখ্‌লি ত?—পারিনে—ব'ললে কোন কাজই পারা যায় না, আর পারি ব'ললে,—সব কাজই পারা যায়।

ঠা। শুধু তাই নয় লীলা, মেজ রাঁধতে শিখেছেও বেশ। বড় বৌয়ের চেয়ে ভাল রাঁধে।

লী। সাধ্‌লেই সিদ্ধি, শিখলে সব কাজই ভাল ক'রে ক'রতে পারা যায়।

মে। তা'তে আমার বাহাদুরী কিছু নেই। ঠাকমা হাতে ধ'রে সব শিখিয়েছেন।

লী। সে ত বটেই, সংসারে পাকা-গিন্নি না থাক্‌লে সে সংসারের বৌ-ঝি কি রান্নাই বল, বা কি ছেলে-পিলে মানুষ করাই বল—কোন কাজই ভাল ক'রে শিখতে পারে না।

(ছোট-বৌয়ের প্রবেশ)

ছো। ঠাকুর শীগ্‌গীর আসবেন, তাঁর চিঠি এসেছে ঠাক্‌মা।

ঠা। কি সুখবর আজ দিলি ছোট। কা'র কাছে চিঠি এয়েছে?

ছো। বড় ঠাকুরের কাছে, তিনি ওপরেই আছেন।

ঠা। চল্ সবাই, কি খবর শুনিগে।

(সকলের প্রস্থান,

আয়ুর্ব্বেদের কথা।

(১)

(আজি) সুপ্তভারত উঠেছে জাগিয়া
লুপ্ত রতন আশে,
(তাই) দীপ্ত-বাসনা জেগেছে এখন
ক্ষিপ্ত-পরাণ পাশে।

ব্যর্থ করিতে বদ্ধ-ধারণা,
মর্ম্ম-মাঝারে কি যেন গাহনা
(ওগো) স্তব্ধ করিছে কে যেন গাহিয়া—
স্নিগ্ধ-মধুর ভাষে।

গর্ব্ব করিয়া কে যেন কহিছে,
মর্ম্ম ভিতরে সে কথা পশিছে,
"সেই আয়ুর্ব্বেদ, জ্ঞানের গরিমা
(দেখ) উদেছে ভারতাকাশে।"

(২)

দেখিলা স্রষ্টা সৃষ্টি লোপ হয়,
পাপের ফলেতে ধরা রোগময়,
আয়ুসকালের অগ্র-সময়ে—
ব্যাধি যে বিশ্বনাশে।

(তাই) ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-কারণে
জীবের কুশল আরোগ্য স্থাপনে
লক্ষ শ্লোক পূর্ণ রচিলা সংহিতা,
—যা'তাঁ'র মনেতে আসে।

দক্ষ প্রজাপতি শিখিলা সে বাণী,
অশ্বিনী-কুমার-দ্বয়ে নিলা মানি,
তাঁরাও রচিলা স্বকীয় সংহিতা
কহিলা ইন্দ্রের পাশে।

ইন্দ্র হইতে আর্য্য ঋষিগণ,
আত্রেয়, অঙ্গিরা, শিখিলা চ্যবন,
আর আর ঋষি সকলে শিখিলা—
বসিয়া আত্রেয়াবাসে।

(৩)

যখন কেশব বেদের উদ্ধার
করিতে হইলা মৎস্য অবতার,
এই 'আয়ুর্ব্বেদ' দেব অনন্ত
লভিলা পরমোল্লাসে।

তিনিই 'চরক,'—মুনিপুত্র হ'য়ে
করিলা সংস্কার পূর্ব্ব শ্লোকচয়ে,
'চরকসংহিতা' রচনা তাঁহারি,
(যাহে) বিশ্ব চমকে ভাসে।

দেব 'ধন্বন্তরি,' 'দিবোদাস' হ'য়ে
জন্মিলা কাশীতে নরদেহ ল'য়ে,
মহর্ষি 'সুশ্রুত' তাঁহারি শিষ্য,—
রোগেরা কাঁপিল ত্রাসে।

শল্য-চিকিৎসা সৃষ্ট তাঁহারি
রোগ ক্লিষ্ট দেখি যত নরনারী,—
লুপ্ত হইয়া গিয়াছে সে সব,
(শুধু) স্মৃতিটি সমুখে আসে।

(৪)

এই 'আয়ুর্ব্বেদ' ভারতে প্রথম,
ভারত হইতে আরবীয়গণ,
আরব হইতে গ্রীসবাসিগণ
লভিল মধুরোল্লাসে।

গ্রীস দেশ হ'তে সমগ্র মেদিনী
শিখিল চিকিৎসা,—শুনিল এ ধ্বনি
শিহরিল সব যুক্তি দেখিয়া ;—
এ শক্তি কেমনে আসে!

(৫)

সব দেশে গেল,—সবাই শিখিল,
ভারত সন্তান কিন্তু গো ভুলিল,
আপনার ধন অপরে প্রদানি,
রহিল দীরঘ শ্বাসে।

এমনি করিয়া জগত চলিছে,
এমনি করিয়া উঠিছে পড়িছে,
দিবসে মার্ত্তণ্ড, নিশায় চন্দ্রমা
(বুঝি) এমনি করিয়া হাসে।

(৬)

সেদিন বিগত হ'য়েছে এখন,
সেই সুখ-সূর্য্য উদেছে তেমন,
আবার ভারতবাসীর প্রাণে
অতীত আশক্তি আসে।
আবার 'বাসক' 'গুলঞ্চ' 'অশোক'
সেই 'কালমেঘ' দিতেছে পুলক,
(এখন) সকলে বুঝেছে, সবই ত র'য়েছে
—ছড়ান বাড়ীর পাশে।
সেই 'পুনর্ণবা' সেই কণ্টকারী'
সেই সে র'য়েছে 'তুলসী-মঞ্জরী,'
আতপতাপিত সেই 'আয়াপান'।
সেই ত ইঙ্গীতে হাসে।

সেই 'অশ্বগন্ধা' শ্রেষ্ঠ রসায়ন,
আর কোথা পাবে এ হেন রতন।
সেই 'হরীতকী' সেই 'আমলকী'
সেই ত পাতার পাশে।

(৭)

যা' ছিল আবার লভিতে হইলে
শিখিতে হইবে গিয়াছি যা' ভুলে,
তা'রই আয়োজন হ'তেছে আবার,
তা'তেই মনেতে আসে,
(আজি) সুপ্তভারত উঠিল জাগিয়া
লুপ্তরতন আশে,
(তাই) দীপ্ত-বাসনা জেগেছে এখন
ক্ষিপ্ত-পরাণ পাশে।

কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত।

অঙ্গরাগ ও অঙ্গরক্ষা।

—:*:—

অধুনা স্বাস্থ্যরক্ষার ন্যায় সৌন্দর্য্য রক্ষাও সভ্যজগতে আদরের সামগ্রী হইয়াছে। এমন কি, স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়াও অনেককে সৌন্দর্য্য রক্ষার জন্য যত্নবান্ হইতে দেখা যায়। সাধারণতঃ অধিকাংশ লোকেই সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির জন্য দুই প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। একটী পরিচ্ছদ ও অপরটী অঙ্গরাগ। এ দুইটী লাবণ্য বৃদ্ধির পক্ষে যে সহায়তা করিয়া থাকে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু অনেক স্থলেই ইহাদের এরূপ অনুপযুক্ত প্রয়োগ হইয়া থাকে, যে এতদ্দ্বারা কেবল বাহ্যসৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করা হয় মাত্র, ইহাতে স্বাস্থ্যরক্ষার কোন সহায়তা ত করা হয়ই না,—বরং ইহার ফলে স্বাস্থ্য বিশেষরূপে বিঘ্ন প্রাপ্ত হইয়া পড়ে। এখনকার দিনে যে সকল মূল্যবান্ পরিচ্ছদ দ্বারা সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়, মূল্যাতিশয্য বশতঃ সেগুলি প্রায় ধৌত করা হয় না, বা যদি করাই হয়, তাহা হইলেও বহুকাল অন্তর তাহার ব্যবস্থা হইয়া থাকে। আবার হয়ত ধৌত করিলে পরিচ্ছদের সৌন্দর্য্যের লাঘব হইবে বলিয়া, চিরকাল অধৌত অবস্থাতেও উহা রক্ষা করা হয়। এইরূপ আচরণে পরিচ্ছদের বাহ্য সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণ থাকে বটে, কিন্তু উহার অভ্যন্তর ভাগ ক্লেদাদি-

সিক্ত হইয়া স্বাস্থ্যহানি ও রোগোৎপাদনের কারণ উপস্থিত করিয়া থাকে। শুধু তাহাই নহে, অনেক সময় অঙ্গাবরণ দ্বারা শারীরিক গঠনবিকাশ বর্দ্ধিত হইবে বিবেচনা করিয়া প্রাকৃতিক গঠনের বৈলক্ষণ্য উৎপাদন করতঃ সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়। ইয়ুরোপাদি পাশ্চাত্য সভ্যদেশে রমণীগণের মধ্যে কর্সেট ব্যবহার ইহার একটী উদাহরণ। চীনদেশীয়া সুন্দরীগণের চরণের ক্ষুদ্রতা সাধনও ঐরূপ। অঙ্গলেপন দ্বারা যে সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি করা হয়, তাহা প্রায় মুখলাবণ্য-বৃদ্ধির জন্য বা অনাবৃত স্থানের লাবণ্যবৃদ্ধির জন্য। যদি স্বাস্থ্যই ভাঙ্গিতে থাকিল, এইরূপ উপায়ে লাবণ্য কতদিন থাকিবে? ইহাতে স্বাস্থ্যহানির সঙ্গে সঙ্গে সৌন্দর্য্যহানিও হইতে থাকিবে।

লাবণ্যবৃদ্ধির প্রধান উপায়—পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য স্নান ও অঙ্গধাবন অতিশয় প্রয়োজনীয়। যেমন মল, মূত্র, শ্বাসপ্রশ্বাস দ্বারা দেহাভ্যন্তর হইতে দূষিত পদার্থ বাহির হইয়া যায়, সেইরূপ স্বেদনির্গমনের সঙ্গেও নানা প্রকার দূষিত পদার্থ বাহির হয়। স্বেদের জলীয় অংশ শুখাইয়া যাইলে, ঐ সকল পদার্থ ত্বকের উপর প্রলেপবৎ জমিয়া থাকে। পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির শরীরে এইরূপ প্রতিদিন যে ক্লেদ সঞ্চিত হয়, উহার ওজন প্রায় /১ সের। যদি এইগুলি পরিষ্কার না করা হয়, তাহা হইলে উহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া স্বেদগ্রন্থিসমূহের মুখ বন্ধ হইয়া স্বেদনির্গমনের পথ রুদ্ধ করিয়া ফেলে। উহার ফলে নানাবিধ চর্ম্মরোগ ও অন্যান্য রোগও উৎপন্ন হইতে পারে। সুতরাং উহা পরিষ্কার করা প্রয়োজন। এইজন্য স্নান ও গাত্রধাবন আবশ্যক। স্নান ও গাত্রধাবনকালে এই জন্যই গাত্রমল উঠাইয়া ফেলিতে হয়। কেবল জলধৌত করিলেই যে গাত্র পরিষ্কার হয় তাহা নয়। গাত্রমল উঠাইবার জন্য গাত্র ঘর্ষণ আবশ্যক। এই গাত্রঘর্ষণের সহায়তার জন্য আমাদের দেশে তৈলাদি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এক্ষণে অনেকে সাবান ব্যবহারও করিতেছেন। সাবানে গাত্র পরিষ্কার অতি সহজে এবং অল্প সময় মধ্যে সম্পন্ন হয় সত্য, কিন্তু উহাতে চূণ ও ক্ষার থাকায় উহা দ্বারা কেবল যে ক্লেদ উঠিয়া যায়, তাহা নহে, উহাতে ত্বকেরও ক্ষতি হইয়া থাকে। তৈল-মর্দ্দনে অধিক সময় আবশ্যক হয় বটে, কিন্তু উহাতে ত্বকের কোন হানি হয় না, বরং মসৃণতা বৃদ্ধি করে। তবে অধিক পরিমাণ তৈল যদি গাত্রে লাগিয়া থাকে এবং ভাল করিয়া ঘর্ষণ বা মর্দ্দন দ্বারা উঠাইয়া ফেলা না হয়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা অনিষ্ট হইতে পারে। ধূলি প্রভৃতি বাহ্য পদার্থ এবং স্বেদস্থ দূষিত পদার্থ তৈল সংযুক্ত হইয়া, অনৈসর্গিক গাত্রমলে পরিণত হয়, উহা দ্বারা স্বেদনালীসমূহ বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু তৈল উত্তমরূপে মর্দ্দন করিলে, কিয়ৎপরিমাণে শরীর মধ্যে শোষিত হয় ও কিয়ৎপরিমাণে গাত্রমলের সহিত সম্মিলিত হইয়া, উহাকে কোমলাকারে পরিণত করে। তখন উহা উঠাইবার সুবিধা হয়। মর্দ্দন দ্বারা মাংসপেশীর ও স্নায়ুমণ্ডলীর অনেক সময় আভ্যন্তরিক যন্ত্রেরও হিত সাধন হয়। গাত্রমল উঠাইবার জন্য কেবল রিক্তহস্তঘর্ষণ কষ্টকর হইয়া পড়ে, তৈলাক্ত হস্তে গাত্র মর্দ্দন করিলে ঘর্ষণ সুখসাধ্য হয়। পরন্তু তৈল দ্বারা গাত্রের কোমলতা, মসৃণতা ও স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। কিন্তু তাহা বলিয়া যেন তৈলকূপে নিমগ্ন হইয়া থাকিবেন না। কোন বিষয়েরই আতিশয্য

ভাল নয়। হিতকর বস্তর ও আতিশয্যে হিতের পরিবর্ত্তে অহিত সাধনই হইয়া থাকে। যাঁহারা সাবান ব্যবহারে অভ্যস্ত তাঁহারা অত্যল্প পরিমাণে সাবান মাখিয়া অঙ্গ ধৌত করিয়া, পরে অল্প পরিমাণে তৈলমর্দ্দন করিতে পারেন।

বেশম ব্যবহার দ্বারাও গাত্রমল পরিষ্কার হয় এবং ইহা সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিরও সহায়তা করিয়া থাকে। ইহা দ্বারা চর্ম্মরোগও নিবারিত হয়। ইহা ব্যবহারে ব্রণাদি চর্ম্মরোগ হইতে পারে না। মসুরের বেশম সর্ব্বাপেক্ষা উপকারী। ছোলার বেশমও মন্দ নহে।

দুধের সর মাখার প্রথা আমাদের দেশে পূর্ব্বে খুবই প্রচলিত ছিল। এখনও পল্লীগ্রামে স্থানে স্থানে উহার প্রচলন আছে। অধুনা ক্রিম, ভ্যাসেলিন্, পোমেড প্রভৃতি বিলাতী দ্রব্য উহার স্থান অধিকার করিয়াছে। ঐ সকল বিলাতী দ্রব্য ব্যবহারে অর্থব্যয় অধিক হয়। কিন্তু ইহাদের অপেক্ষা দুধের সরের যে লাবণ্যবর্দ্ধিনী শক্তি অধিক, তাহা আমাদের পরীক্ষিত। দুধের সর ও বাদাম একত্রে শিলাপিষ্ঠ করিয়া মুখমণ্ডলে বা অন্যান্য অঙ্গে প্রতিদিন লেপন করিলে, তত্রত্য ত্বকের বর্ণের উৎকর্ষ সাধিত হয় অর্থাৎ গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়।

পূর্ব্বে আমাদের দেশে হরিদ্রালেপনের প্রথা ছিল। এখনও উড়িষ্যা, দাক্ষিণাত্য, ও পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন স্থানে হরিদ্রা লেপনের প্রথা আছে। উহাও বোধ হয় সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির জন্য। এইজন্যই পূর্ব্বে বোধ হয় পীতবর্ণকেই লোকে গৌরবর্ণ বলিতেন। এখনকার বিবিয়ানা গৌরবর্ণ বোধ হয় তাঁহারা ভাল বাসিতেননা বা তৎসম্বন্ধে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা ছিল না। পীতবর্ণ যে গৌরবর্ণ বলিয়া অভিহিত হইত, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। 'সোণার বরণ,' 'কাঁচা সোণার রং,' 'তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় বর্ণ' ইত্যাদি কথা প্রাচীন কালের অনেক গ্রন্থে পাওয়া যায়। আধুনিক গ্রন্থকারেরাও এই সকল কথা বহুল ব্যবহার করেন। আমরাও কথায় কথায় বা গল্প করিতে করিতে এই সকল কথা ব্যবহার করিয়া থাকি। সুতরাং সোণার ন্যায় পীতবর্ণ যে এ দেশের গৌরবর্ণ ছিল তাহার আর সন্দেহ নাই। বিবাহের পূর্ব্বে গাত্রহরিদ্রা নামক যে মাঙ্গলিক ক্রিয়া সম্পাদিত হয়, উহাও বোধ হয় বর-কন্যার সৌন্দর্য্যসাধনের জন্য। আজকাল অনেক সৌখীন বাড়ীতে পাত্রী দেখাইবার সময় পেণ্ট্ করিয়া দেখান হয়। এ পেণ্ট্ অবশ্য কাঁচা সোণার রং নহে, উহা বিবিয়ানা রং। পেণ্টের রং ধৌত করিবামাত্র উঠিয়া যায়, হরিদ্রার রং ধৌত করিলেও সহজে যায় না। কিন্তু আধুনিক সভ্যতায় কাঁচা সোণার রং রুচিবিরুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং হরিদ্রালেপনও রহিত হইয়াছে। এমন কি, বিবাহের সময় মাঙ্গলিক ক্রিয়া সম্পাদনার্থ অনেক স্থলে কেবল ললাটে ফোঁটা দেওয়া হয় মাত্র। হরিদ্রা-লেপনে নানারূপ চর্ম্মরোগ নিবারিত হয়। গাত্রে হরিদ্রা লেপন করিলে কীট-মশকাদির দংশন হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। যাহা হউক রুচিবিরুদ্ধ বলিয়া এ সম্বন্ধে আর অধিক আলোচনার আবশ্যক নাই।

এইবার পরিধেয় সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়া, আমাদের প্রবন্ধ শেষ করিব। তাপ ও শৈত্যের আক্রমণ হইতে স্বাস্থ্যরক্ষা করা ও লজ্জা নিবারণ—এই উভয় উদ্দেশ্যে গাত্রাবরণ প্রয়োজন। তাপ ও শৈত্য হইতে শরীর-রক্ষার জন্য পশু পক্ষী প্রভৃতি ইতর প্রাণীর নৈসর্গিক

আবরণ আছে। পরিধেয় বস্ত্র দ্বারা আমরা আমাদের গাত্র আবৃত করিয়া থাকি। দেশ-কাল বিশেষে পরিধেয়ের বিভিন্নতা হইতে পারে। আমাদের উষ্ণপ্রধান দেশে পরিধেয় পাৎলা, লঘু ও শ্বেতবর্ণ হওয়া আবশ্যক। শীত-কালের পরিধেয় অপেক্ষাকৃত মোটা হওয়া উচিৎ। কার্পাস নির্ম্মিত শ্বেতবস্ত্র মন্দ পরিধেয় নয়। গরদ বা তসরের কাপড় সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। ইহা প্রথমতঃ ব্যয়সাধ্য বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু হিসাব করিয়া দেখিলে কার্পাস-বস্ত্র অপেক্ষা সুলভ। এক জোড়া তসর কাপড় ৫।৬ বৎসর খুব টেকে। প্রতিদিন জলধৌত করিয়া ও আট দশ দিন অন্তর একবার করিয়া, রিটা দ্বারা ধৌত করিলে বেশ পরিষ্কার থাকে। রেশম তাপ, শৈত্য-রোধক। সুতরাং তসর বা গরদ কাপড় দ্বারা শরীরের উত্তাপ রক্ষিত হয় এবং বাহ্য তাপ-শৈত্যের আক্রমণ হইতে শরীর অক্ষুণ্ণ থাকে। আমাদের পরিধেয় ঢিলা হওয়া আবশ্যক। আঁট বা টাইট পরি-চ্ছদ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পুষ্টি-সাধনের বিঘ্ন ঘটায়। শুভ্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছদই স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রয়োজনীয়। স্বাস্থ্য ভাল থাকিলেই সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে। পোষাক পরিচ্ছদের চাকচিক্যে সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধির চেষ্টা করা,—ছেঁড়া-চুলের খোঁপা বাঁধার ন্যায় অস্থায়ী।

ডাঃ শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাস।

হার্ট ডিজিজ্‌ ও হৃদ্‌রোগ।

—:*:—

মাননীয়

শ্রীযুক্ত আয়ুর্ব্বেদপত্র সম্পাদক মহোদয়গণ

সমীপেষু।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর।)

পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুতি অনুসারে হার্টডিজিজ্‌ ও হৃদ্‌রোগ নামক প্রবন্ধের অবশিষ্টাংশ পাঠাই-তেছি। আশাকরি, পূর্ব্ববারের ন্যায় অনুগ্রহ পূর্ব্বক এবারেও আপনাদের বিখ্যাত পত্রের এক পার্শ্বে ইহার জন্য কিঞ্চিৎ স্থান দানে বাধিত করিবেন।

পরিশেষে প্রতিপক্ষ যে একটা সাংঘাতিক আপত্তি উদ্ভাবিত করিয়াছেন, তাহা শুনা মাত্র ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর মর্ম্মে যে নিদারুণ শূল বিদ্ধ হইবে এবং আর্য্যজাতির ভবিষ্যৎ ভাবিয়া, তাঁহারা যে শোক-দুঃখে মুহ্যমান হইয়া পড়িবেন, তাহার আর অনুমাত্রও সন্দেহ নাই।

তাঁহারা বলেন,—"তাঁহারা, ডাক্তার বাবু-দের কাছে শুনিয়াছেন, এবং নিজেরা ও শব-চ্ছেদ করিয়া দেখিয়াছেন যে, আমাদের কথিত হৃদয়ের স্থানে (আমাশয় মুখে) হৃদয়ের আকারের কিছুই দেখিতে পান নাই।" সুতরাং সমস্ত তর্কের মূল হৃদ্মর্ম্মটা "আকাশ-কুসুমবৎ দ্রব্যহীন নাম মাত্র।"

এই আপত্তির কোন উত্তর দেওয়ার পূর্ব্বে আমরা আপত্তিকারী কবিরাজ মহাশয়

দিগকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, যে, যেখানে ডাক্তার বাবুরা কিছু দেখেন নাই, আপনারাও কিছু দেখিতে পান নাই, সেই সেই স্থানে কি কিছুই থাকিতে পারে না? শত শত ব্যক্তি যে স্থানে কোনও এক বস্তুর ঘ্রাণানুভব করিতেও পারে না, দুই এক ব্যক্তি সেখানে তীব্র গন্ধ পায়। এইরূপে দৃষ্টিশক্তির প্রখরতার তারতম্য বশতঃ দর্শন শক্তিরও ন্যূনাতিরেক হইতে পারে। হইতে পারে, আপনাদের পরিচিত ডাক্তার বাবুরা বা আপনারা হৃদয়ের স্থলে কিছুই দেখিতে পান নাই। তা' বলিয়া আয়ুর্ব্বেদ,—কেবল আয়ুর্ব্বেদ কেন, যোগ, তন্ত্র, সাহিত্য, পুরাণ প্রভৃতি হিন্দুর যাবতীয় শাস্ত্রের প্রাণ স্বরূপ এবং আর্য্য চিকিৎসা গ্রন্থের, প্রায় অধিকাংশ প্রধান প্রধান রোগের মূল স্বরূপ এই হৃন্মর্ম্মটার অস্তিত্ব অস্বীকার করা সমীচীন কি? আমরা যাহা দেখিতে পাই না, তাহারই অস্তিত্বে অবিশ্বাস করাটা ত শুভ লক্ষণ নহে।

এই যে আমাদের বাস গৃহে প্রকাণ্ড কাঠের কপাট রহিয়াছে এবং তাহাতে যে অগণিত ছিদ্র রহিয়াছে, তাহার একটাও কি আমরা দেখিতে পাই? না পাইলেও কি উহা সচ্ছিদ্র বলিয়া আমরা সকলেই স্বীকার ও বিশ্বাস করি না। যদি তাহাই করা যায়, তবে যোগবলে অপ্রমেয় শক্তি সম্পন্ন মহর্ষি দিগের উপর আপনাদের এত অকৃপা কেন? একি কাল মাহাত্ম্য!

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রটা কিছু "নরু হরু"র লেখা বা উন্মত্ত প্রলাপ কিম্বা অজ্ঞ জনের কপোল কল্পিত কল্পনা বাক্য নয়! যে মহর্ষিগণ ভূতলে থাকিয়া ও লক্ষ লক্ষ যোজন দূরস্থ গ্রহাদির আকার প্রকার, গতি বিধি ও গম্যপথ নখ-দর্পণের মত দেখিয়া, জ্যোতিষশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, যে জ্যোতিষের বার, তিথি, নক্ষত্র ও গ্রহণাদি ব্যাপার অদ্যাপিও ঐ শাস্ত্রের অভ্রান্ততার জাজ্বল্যমান প্রমাণ দিতেছে, এবং অযোগী সাধারণ মনুষ্যের স্থূল দৃষ্টি এবং যন্ত্রাদির অগোচর সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম বস্তুও যাঁহারা সহজ দৃষ্টিতে "করামলকবৎ" প্রত্যক্ষ করণে সমর্থ ছিলেন, সেই সুতীক্ষ্ণ জ্ঞানেন্দ্রিয় শালী সত্যব্রত লোকহিতরত নিঃস্বার্থপর মহর্ষিগণই এই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রেরও প্রণেতা। তাঁহারা যে না জানিয়া, না শুনিয়া, না দেখিয়া স্ব স্ব প্রণীত গ্রন্থে এই হৃন্মর্ম্মটার কথা মিথ্যা করিয়া রচিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, যে সাহসে আপনারা এই কথা বলেন, সেই সাহসকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না।

যোগবলে ইন্দ্রিয় শক্তির যে কতদূর উন্নতি জন্মিতে পারে, তাহা আমাদের মত অযোগী পুরুষের বুদ্ধি ও ধারণারও অতীত।

আর্য্যজাতির এই চরম অধঃপতনের কালেও যোগবলে যেরূপ আশ্চর্য্য ঘটনা সংঘটিত হইতেছে এবং যোগীদিগের ইন্দ্রিয় শক্তির বিশেষতঃ জ্ঞানেন্দ্রিয় শক্তির যেরূপ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে বর্ত্তমান যোগিগণের গুরুস্থানীয় আয়ুর্ব্বেদ প্রণেতা মহর্ষিগণের দর্শন-শ্রবণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় শক্তির একটা ধারণা ও আমাদের আসিতে পারে না।

আয়ুর্ব্বেদানুশীলনকারী ব্যক্তি মাত্রেরই জানা আছে যে, দ্বৈপায়ন বেদব্যাসেরও সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, তাঁহার গুরুকল্প মহর্ষিগণ ভূ-লোকে আয়ুর্ব্বেদ প্রচার উদ্দেশ্যে আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থাদি প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

এই বেদব্যাসই যখন অপর এক ব্যক্তিকে ঘরে বসিয়া সুদূর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ব্যাপার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিবার এবং সমুদ্র কল্লোলবৎ কোলাহলপূর্ণ যুদ্ধস্থলস্থ লোকের পরস্পর কথোপকথন স্পষ্টাক্ষরে শুনিবার শক্তি প্রদান করিতে পারিয়াছিলেন, তখন স্বয়ং বেদব্যাসের দর্শন ও শ্রবণ শক্তির একটা ইয়ত্তা করাও আমাদের সাধ্যাতীত। এখন এই বেদব্যাসের গুরু স্থানীয় আত্রেয়, বশিষ্ট, পরাশর প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদ প্রণেতা মহর্ষিগণের দর্শন-শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়-শক্তির প্রখরতা যে আমাদের ধারণা এবং কল্পনারও অতীত ছিল, তৎসম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

যোগবলে দর্শন শক্তির একটী বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত আমরা অত্যল্প কাল পূর্ব্বের ঘটনা অবলম্বনে দেখাইতেছি। (ঘটনার সমসাময়িক বহু লোক এখনও জীবিত আছেন)। ঘটনাটি এইরূপ—ঢাকা জেলার অন্তর্গত বারদী গ্রামে ৺লোকনাথ ব্রহ্মচারী নামে এক মহাপুরুষের আশ্রম ছিল। উক্ত মহাপুরুষকে কোনও এক বিচারালয়ে সাক্ষী স্বরূপে উপস্থিত হইতে হইয়াছিল। সাক্ষ্য দেওয়ার সময়ে যতদূর হইতে ঘটনা দেখার কথা, ব্রহ্মচারী মহাশয় বলিয়াছিলেন, ততদূর হইতে ঐ রূপে ঘটনা দেখা সাধারণ মানুষের পক্ষে একবারেই অসম্ভব। তাই বিপক্ষের মোক্তার বাবু, ব্রহ্মচারী মহোদয়ের উক্তি মিথ্যা প্রতিপন্ন করার অভিপ্রায়ে ব্যঙ্গস্বরে বলিয়াছিলেন, —মহাশয় এতদূর হইতে এইরূপে ঘটনা দেখা কি সম্ভব? তদুত্তরে ব্রহ্মচারী মহাত্মা বলিয়াছিলেন, "দেখ, মোক্তার বাবু! ঐ যে (অঙ্গুলী নির্দ্দেশে দেখাইয়া) দূরে একটা গাছ দেখিতেছেন, ওটা কি গাছ বলিতে পারেন?" উত্তরে মোক্তারবাবু গাছের বিদ্যমানতা মাত্র স্বীকার করিলে ব্রহ্মচারী বলিলেন, "দেখ বাবু! আমি ঐ গাছের পাতাগুলি স্পষ্ট দেখিতেছি। বলিতেছি ওটা কাঁঠাল গাছ; আর ঐ গাছের মূল দেশ হইতে এক ঝাঁক লাল পিপড়া উহার কাণ্ড পর্য্যন্ত উঠিতেছে; আমি উহার এক একটা পিপড়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্ররূপে দেখিতেছি।" এই কথা শুনিয়া সকলেই বিস্ময়াপন্ন এবং কৌতূহল পরবশ হইয়া সেই গাছের তলায় যাইয়া দেখিলেন, ব্রহ্মচারীর কথা বর্ণে বর্ণে সত্য।

অতঃপরও যদি প্রতিপক্ষ বলেন, মহর্ষিগণ সহজ দৃষ্টি প্রভাবে সৌর জগতের বিষয় অবগত হইতে পারেন নাই, যন্ত্র বলেই তাঁহারা সৌর জগতের বিবরণ অবগত হইয়া জ্যোতিষশাস্ত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইলে, যন্ত্রবলেই মহর্ষিগণ, মানব দেহের অস্থি, মাংস, শিরা, ধমনী এবং মর্ম্মাদি অবগত হইয়াছিলেন এরূপ বিশ্বাসত করা উচিত, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহাতেও প্রতিপক্ষের অল্পমাত্রও বিশ্বাস নাই।

শিক্ষিত ভারতবাসীমাত্রেই জানেন, যে, ভারতের চরম উন্নতির সময়ে পূর্ণাবয়ব আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা-প্রভাবেই ছিন্ন-শিরস্ক ব্যক্তি যুক্তশির হইয়া পুনর্জীবিত হইতেন। এই আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা-প্রভাবেই পূর্ব্বদিনের ক্ষত বিক্ষত দেহ যোদ্ধৃবৃন্দ তৎপরদিনই অক্ষত দেহে পূর্ণ বলবীর্য্যে যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছেন—এরূপ ঘটনাও অনেক ঘটিয়াছে। সেই প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে, মনুষ্যত্বের বীজ, চেতনার আধার স্বরূপ, বহু রোগের আশ্রয় স্থল এই হৃন্মর্ম্মটা (শুধু হৃন্মর্ম্ম নয় তদাশ্রিত চতুর্ব্বিংশ ধমনী, তাহাদের নাম, স্থান ও

কার্য্যাদি) মিথ্যা করিয়া লেখা সম্ভবপর কি?

আমরা স্পর্দ্ধা সহকারে বলিয়া থাকি, "আর্য্য চিকিৎসা শাস্ত্র পৃথিবীর যাবতীয় চিকিৎসা শাস্ত্র হইতে শ্রেষ্ঠ" এই কথার মূলে কোন সত্য নিহিত আছে, না ইহা অপরিণত বয়স্ক ও অপরিণত মস্তিষ্ক ব্যক্তির স্বভাব-সুলভ চপলতা সম্ভূত?

এক'টুকু সামান্য চিন্তা করিয়া দেখিলেই আমরা বুঝিতে পারি, যে, এই উক্তি একেবারে অসঙ্গত নহে। আমরা দেখিতে পাই যে, পৃথিবীতে প্রচলিত অপরাপর সমস্ত চিকিৎসাই সাক্ষাৎ বা পরম্পরা ভাবে, ন্যূনাধিক পরিমাণে এই আর্য্য চিকিৎসার নিকটে ঋণী। এইটী আমাদের সুখ ও সৌভাগ্যের বিষয় বটে, কিন্তু এতদ্দ্বারা আয়ুর্ব্বেদের সর্ব্ব-প্রাধান্য নিঃসন্দিগ্ধ রূপে প্রমাণিত হইতে পারে না। কালে গুরু হইতেও শিষ্যের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান জন্মিতে পারে। আয়ুর্ব্বেদের প্রাধান্য প্রতিপাদক বহু বিষয় রহিয়াছে। তন্মধ্যে বর্ত্তমান প্রবন্ধের সহিত বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট একটী বিষয়ের উল্লেখ করিয়া উপরোক্ত বিষয় বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

দিন দিন উন্নতি অভিমুখে ধাবিত রাজশক্তি পৃষ্ঠপোষিত ইউরোপীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান যে সমস্ত সূক্ষ্ম শারীর তত্ত্বের আবিষ্কারে অকৃত কার্য্য রহিয়াছেন, আর্য্য ঋষিগণ অতুলনীয় শক্তিবলে, বিভিন্ন দেশে চিকিৎসার সূত্রপাতের ও সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, সেই সমস্ত গূঢ় শারীরতত্ত্ব ও তত্তৎ যন্ত্রের ব্যাধি ও চিকিৎসা আবিষ্কার পূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, ঐ সমস্ত শারীর যন্ত্র মধ্যে মর্ম্মগুলি এক শ্রেণীর যন্ত্র। সর্ব্বদেহে তাঁহারা ১০৭টী মর্ম্ম নির্দ্দেশ পূর্ব্বক উহাদিগকে বিভিন্ন শাখা শ্রেণীতে বিভক্ত করতঃ তৎসমস্তের অবস্থিতি স্থান ও ক্রিয়াদি এবং কোন্‌টী আহত হইলে দেহীর কিরূপ অনিষ্ট সংঘটিত হয় তাহাও বিশদরূপে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই অংশে আয়ুর্ব্বেদ অতুলনীয়, এই অংশে আয়ুর্ব্বেদের প্রতিদ্বন্দ্বী চিকিৎসা শাস্ত্র জগতে নাই। এই অংশেই আয়ুর্ব্বেদের অবিসম্বাদী প্রাধান্য, এই শ্রেণীর মধ্যে শিরামর্ম্ম শ্রেষ্ঠ। তন্মধ্যে আবার হৃন্মর্ম্ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই হৃন্মর্ম্ম অবলম্বনেই বর্ত্তমান প্রবন্ধ লিখিত।

আমাদের বিরুদ্ধ মতাবলম্বী কবিরাজ মহাশয়েরা প্রায় সকলেই সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত, খাঁটি কবিরাজ, শুধু ডাক্তারী কুহকে মজিয়াই তাঁহাদের এই শোচনীয় পরিবর্ত্তন। ঋষিবাক্যে এই ঘোরতর অবিশ্বাস। জানিনা, তাঁহাদের এই শুভানুধ্যায়ী ডাক্তার বন্ধুগণ কোন্ শ্রেণীর ডাক্তার। খৃষ্টধর্ম্মালম্বী খাঁটী বিলাতী পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিদ্যায়—পারদর্শী সুবিখ্যাত পণ্ডিত ডাক্তার ওয়াইজ প্রমুখ সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার সাহেব মহোদয়গণও ত এই মর্ম্মগুলির অস্তিত্বে অবিশ্বাস করেন নাই। এমন কি তাঁহারা এই বিষয়ে একটুকু সন্দিহানও হন নাই। তাঁহারা যে এই গুলির অস্তিত্বে বিশ্বাস করিয়াছেন, তাঁহাদের কথায় ত ইহাই বুঝা যায়। তাঁহারা বলিয়াছেন, হিন্দু চিকিৎসা বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ, কোন ও অপ্রাকৃত শক্তি (Supernatural power) প্রভাবে এই তত্ত্বের (মর্ম্মের) আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন।

ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বিজাতীয় চিকিৎসা-তত্ত্ব-বিদ্ এই সমস্ত বিখ্যাত পণ্ডিতগণের মুখে

আয়ুর্ব্বেদের প্রাধান্য সূচক এই প্রকার কথা শুনিলে, কোন্ আর্য্য বংশধরের অন্তঃকরণ আনন্দে না উৎফুল্ল হইয়া উঠে! কিন্তু আমরা অধঃপতনের এমন চরম সীমায় উপনীত হইয়াছি যে, অতি উপাদেয় হইলেও নিজস্ব বস্তুর উপর আমরা একান্ত বীতশ্রদ্ধ। উহা দেখিলেও যেন আমাদের অশ্রদ্ধার উদয় হয়। হে ভগবন্, কবে আমাদের এই কুহক ভঙ্গ হইবে?'

আমাদের করতলে মধ্যাঙ্গুলী মূলে তল মর্ম্ম নামে একটী মর্ম্ম আছে। তাহাতে সূচী বিদ্ধ হইলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটে। অথচ হাতের কব্জাটা সমস্ত কাটিয়া ফেলিলেও মানুষ জীবিত থাকে। এই গূঢ় রহস্য আর্য্য চিকিৎসা গ্রন্থ ব্যতীত আর কোথাও আছে কি? বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্যেও একটী স্নায়ুমর্ম্ম আছে। এই মর্ম্মে শস্ত্রাঘাতে কালান্তরে আক্ষেপ (ধনুষ্টঙ্কারাদি) জন্মিয়া মৃত্যু হয়। ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশস্থ কোনও হাসপাতালে বাতরোগযুক্ত এক রোগী উপস্থিত হইলে, সিবিলসার্জ্জন উহাকে অস্ত্র দ্বারা আরোগ্য করিতে হইবে, ঠিক করিলেন। কিন্তু ভারতবাসী হিন্দু আসিষ্টাণ্ট বাবু, সাহেবকে বলিলেন, হিন্দু চিকিৎসা শাস্ত্রমতে এই স্থানে "ক্ষিপ্রমর্ম্ম নামে" একটী মর্ম্ম আছে, তাহাতে অস্ত্রাঘাত লাগিলে কালান্তরে টিটেনাস হইয়া রোগীর প্রাণ বিনাশের আশঙ্কা। সুতরাং অস্ত্র প্রয়োগে নিরস্ত থাকাই আমার মত। একে ত সাহেবের কেতাবে একথা নাই, তাহাতে অধীনস্থ নেটিবের কথানুযায়ী কার্য্য করিলে সাহেবের প্রেস্‌টিজ থাকে না; কাজেই সাহেব নেটিবের কথা অগ্রাহ্য করিয়া, শস্ত্রপাত অর্থাৎ "সকৃসেস্‌ফুল্ অপারেসন্" করিয়া টেবিল চাপড়াইয়া, শত মুখে হিন্দু চিকিৎসার অসারতা প্রমাণ এবং ত্রিরাত্রি পর্য্যন্ত আসিষ্টাণ্টের শ্রাদ্ধ করিলেন। চতুর্থ দিনে রোগীর টিটানাস্ উপস্থিত হইল। তখন হইতেই সাহেবের মস্তক নত হইল ও বাক্‌শক্তি বিরহিত হইল। (চিকিৎসা সম্মিলনী পত্রিকা দেখুন) অতএব সানুনয় অনুরোধ, কোনও ডাক্তারের কথা শুনিয়া কিম্বা ডাক্তারী পুস্তক পাঠ করিয়া, পরম কারুণিক ঋষিবাক্যে অশ্রদ্ধাপর না হইয়া, আসুন আমরা সকলে মিলিয়া আর্য্য চিকিৎসার বিজয় বৈজয়ন্তী স্বরূপ এই মর্ম্মগুলি, যত্র তত্র মস্তকে লইয়া বেড়াই।

বিনয়াবনত—

শ্রীরাজকুমার দাশগুপ্ত।

পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ ও টোট্‌কা ঔষধ।

অজীর্ণে ব্যবস্থা—অজীর্ণ বশতঃ অপাক দাস্ত হইলে, লবণ দুই আনা এবং যমানি (যোয়ান) দুই আনা না চিবাইয়া একটু জলের সহিত গিলিয়া ফেল, বিশেষ উপকার পাইবে।

অগ্নিমান্দ্যের যোগ।—(১) আঁটি বাদ দিয়া হরীতকীর গুঁড়া দুই আনা, শুঁঠের গুঁড়া দুই আনা, পুরাতন গুড় দুই আনা এবং সৈন্ধব লবণ দুই আনা এই চারিটী দ্রব্য একত্র মিশাইয়া প্রত্যহ সেবন কর,

অগ্নির দীপ্তি হইবে। (২) প্রত্যহ শুঁঠের গুঁড়া দুই আনা একটু গব্যঘৃতের সহিত মিশাইয়া অর্দ্ধ ছটাক গরম জলসহ পান করিলে অগ্নির দীপ্তি হইয়া থাকে। (৩) অল্প পরিমাণে আদার কুচি এবং সৈন্ধব লবণ প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন কর, অগ্নির দীপ্তি হইবে। (৪) পিপুলের গুঁড়া চারি আনা ও পুরাতন গুড় চারি আনা প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন করিলে মলবদ্ধতা নষ্ট হইয়া অগ্নির দীপ্তি হইয়া থাকে।

স্বরভঙ্গে সুব্যবস্থা।—(১) কতকগুলি কচি কুলপাতা তুলিয়া একটু সৈন্ধব লবণের সহিত মিশাইয়া গব্যঘৃতে ভাজিয়া কয়েক দিন সেবন কর,—স্বরভঙ্গ সারিয়া যাইবে। (২) সমান ভাগে হরিতকী ও পিঁপুলের গুঁড়া একটু সরিষার তৈলে মাথাইয়া মুখে ধারণ কর, স্বরভঙ্গে উপকার হইবে। (৩) পাঁপড়িখয়েরের গুঁড়াও ঐরূপ তৈলাক্ত করিয়া মুখে রাখিলে স্বরভঙ্গের উপশম হয়।

দন্তরোগের ব্যবস্থা।—যে কোন কারণে দাঁতের বেদনা হইলে অর্দ্ধআনা সৈন্ধব লবণ অর্দ্ধ গ্লাস জলে ভিজাইয়া রাখ। প্রত্যহ রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে ঐ জলে কুলকুচা কর, যন্ত্রণার নিবৃত্তি হইবে। বেদনার সহিত দাঁত নড়িতে থাকিলেও এই যোগে আশু উপশম হইয়া থাকে। ইচ্ছা করিলে রাত্রির মত দিবসেও ইহার ব্যবহার করিতে পারা যায়।

শূলবেদনার মহৌষধ।—(১) শামুকের খোলা ভস্ম করিয়া, সেই ভস্ম দুই আনা মাত্রায় প্রত্যহ প্রাতঃকালে এক ছটাক গরম জলের সহিত পান কর,—শূল বেদনা সারিয়া যাইবে। এই ঔষধ সেবনের পূর্ব্বে একটু গব্য ঘৃত মুখবিবরে মাথাইয়া লইও। (২) প্রত্যহ প্রাতঃকালে আঁটিবাদ দিয়া আমলকীর গুঁড়া চারি আনা লইয়া মধু ও গরম জলের সহিত সেবন করিলে শূল রোগের শান্তি হইয়া থাকে। (৩) প্রত্যহ প্রাতঃকালে মধুর সহিত শতমূলীর রস পান করিলে শূলরোগের উপশম হয়। (৪) বিল্ব (বেল) বৃক্ষের মূলের ছাল, এরণ্ড (বাগ্ ভেরেণ্ডা) মূল, চিতামূল, শুঁঠ, হিং ও সৈন্ধব লবণ—সবগুলি সমানভাগে লইয়া, একত্র করিয়া, জল দিয়া বাটিয়া লও। শূল রোগীর বেদনার সময় উহা তাহার উদরে বেশ করিয়া প্রলেপ দাও, যন্ত্রণার আশু শান্তি হইবে।

কর্ত্তিতস্থানের রক্তবন্ধের উপায়।—(১) কতকগুলি আপাং বা অপামার্গের পাতা তুলিয়া রস কর। কর্ত্তিত স্থানে উহা লাগাইয়া দাও, সঙ্গে সঙ্গে রক্ত বন্ধ হইবে। (২) কতকগুলি দূর্ব্বাঘাস তুলিয়া রস বাহির করিয়া কর্ত্তিত স্থানে লাগাইয়া দাও, তৎক্ষণাৎ রক্ত বন্ধ হইবে। (৫) কয়লার গুঁড়া লাগাইলেও সদ্যোঃ রক্তবন্ধ হইয়া থাকে।

পতনের বেদনানাশের ব্যবস্থা—হঠাৎ পড়িয়া গিয়া স্থান-বিশেষে আঘাত লাগিলে, খানিকটা টাট্‌কা গোবর অনেকখানি জলে গুলিয়া ফুটাইয়া লও। তাহার পর, আহত স্থানে সেই জল অল্পে অল্পে ঢালিতে থাক, সঙ্গে সঙ্গে একজন হাত দিয়া মর্দ্দন করিতে থাক। যে কয় দিন না আহত স্থান ভালরূপে সারিবে, সে কয় দিন প্রত্যহ সকালে-সন্ধ্যায় এই ব্যবস্থা করিও।

বৃশ্চিক দংশনে ব্যবস্থা—(১) হুঁকার জল দ্বারা ধৌত করিলে বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা নিবৃত্তি হয়। (২) তুলসীর মূল বাটিয়া একটী গুটিকা কর। সেই গুটিকা বৃশ্চিক দংশন স্থানে লাগাইতে থাক,—বিষ নষ্ট হইবে।

কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত।

আয়ুর্ব্বেদে নিদ্রাতত্ত্ব।

—:*:—

আহার, সুনিদ্রা ও ইন্দ্রিয়-দমন (যম ও দম) এই তিনটী শরীরের উপস্তম্ভ বা ধারক। এই তিনটী উপস্তম্ভ যুক্তি পূর্ব্বক ব্যবহৃত হইলে আয়ুঃ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত শরীরে বল ও বর্ণের উপচয় হয়। আয়ুর্ব্বেদে নিদ্রা, ক্ষুধা, পিপাসা, জরা, মৃত্যু প্রভৃতিকে স্বাভাবিক ব্যাধি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। আহার ব্যতীত যেমন আমদের শরীরধারণ অসম্ভব, নিদ্রা ব্যতীতও তদ্রূপ জীবনধারণ করা যায়না। সুখদুঃখ, বলাবল, পুষ্টিকৃশতা, ক্লীবতা, জ্ঞান, অজ্ঞান এবং জীবন, মরণ, নিদ্রা আয়ত্ব। অকালে বা অধিক পরিমাণে নিদ্রা সেবন করিলে অথবা নিদ্রা একেবারে সেবন না করিলে, মনুষ্যের স্বাস্থ্য ও আয়ু শেষ হইয়া থাকে। অপিচ নিদ্রা যুক্তিপূর্ব্বক সেবন করিলে, দেহের সুখ ও দীর্ঘায়ুলাভ হইয়া থাকে। অনাহারের ন্যায় অনিদ্রাও জীবের মৃত্যুর কারণ হয়। ১৭৫৯ খৃঃ অব্দে চীনদেশীয় জনৈক বণিক হত্যাকরার অপরাধে নিদ্রা-বিহীন মৃত্যুদণ্ডের আদেশ প্রাপ্ত হন, প্রহরী বেষ্টিত অবস্থায় তাঁহাকে কারাগারে আবদ্ধ করা হইল। আহার বিহারাদি সম্বন্ধে তাঁহার প্রতি কোনরূপ কঠোরতার ব্যবস্থা করা হইল না। কিন্তু নবম দিনে তাঁহার যন্ত্রণা এত অসহ্য হইয়াছিল যে, তিনি প্রহরীদিগকে তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য কাকুতিমিনতি করিতে-লাগিলেন। এই অবস্থায় অষ্টাদশ দিবসে তাঁহার প্রাণবিয়োগ ঘটিল।

যেমন ভুক্তদ্রব্যের সম্যক পরিণত রস অদৃষ্ট কর্ম্ম ও হেতুর দ্বারা আমাদের দেহকে তর্পণ, বর্দ্ধন, ধারণ যাপন করিয়া জীবিত রাখে, তদ্রূপ অদৃষ্ট হেতু ও কর্ম্মের দ্বারা নিদ্রা আমাদের দেহকে তর্পণ, বর্দ্ধন, ধারণ, যাপন করিয়া জীবিত রাখিতেছে। দৈনিক পরিশ্রমে আমাদের শরীরের যে ক্ষয় উৎপন্ন হয়, নিদ্রা-কালে তাহা পূরণ হইয়া থাকে। নিদ্রা বৈষ্ণবী, শান্তিদায়িনী, দুঃখনাশিনী, ভূতধাত্রী বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

নিদ্রা আর কিছু নয়,—বোধের অভাব নিদ্রা এবং নিদ্রায় অভাব জাগরণ-বোধ। জীবের বোধ বা বুদ্ধি কি? দৃষ্টি, শ্রবণ, ঘ্রাণ, রসন ও স্পর্শ—এই পঞ্চবুদ্ধি বা জ্ঞানেন্দ্রিয়। এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের উপকরণ দ্রব্য যথাক্রমে জ্যোতি, আকাশ, ক্ষিতি, জল, ও বায়ু। এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের আশ্রয় বা অধিষ্ঠান স্থান যথা-ক্রমে অক্ষিদ্বয়, কর্ণদ্বয়, নাসিকাদ্বয়, জিহ্বা, ও ত্বক্। এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের ভোগ্য বিষয় যথা-ক্রমে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ। এই পঞ্চেন্দ্রিয় বোধ যথাক্রমে দর্শন-বোধ, শ্রবণ-বোধ, ঘ্রাণবোধ, স্বাদবোধ ও স্পর্শবোধ, এবং

ইহারা বুদ্ধি নামে অভিহিত। ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ার্থ, মন ও আত্মা এক যোগ হইলেই বোধের উদয় হয়। ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ার্থ ও আত্মা ইহাদের সংযোগ হইলেও মনোযোগ ভিন্ন ইন্দ্রিয় জ্ঞান বা বোধ হয় না।

মনের অস্তিত্ব, জ্ঞান বা জ্ঞানের অভাব দ্বারা জানা যায়। মনঃ একাদশ ইন্দ্রিয়ের অন্যতম—অতএব মন একটি স্বতন্ত্র বস্তু। মনকে অন্তঃকরণ, সত্ত্ব, অতীন্দ্রিয় এবং অন্তরীন্দ্রিয় কহে। যাহা চিন্তা, বিচার, তর্ক, ধ্যান, বা সংকল্প করা যায় এবং যাহা জ্ঞেয়—তৎসমস্তই মনের বিষয়। তর্ক ও বিচার মন হইতে উৎপন্ন হয় এবং তৎপরে বুদ্ধির প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়গণ যে ইন্দ্রিয়ার্থ গ্রহণ করে, তাহা মনের সাহায্যেই করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের পর মনের কার্য্য হয়, তাহা স্বগুণ হইতে পারে, সদোষও হইতে পারে। পরে বুদ্ধির প্রবৃত্তি হয়। মনের যে নিশ্চয়তা তাহাকে বুদ্ধি কহে। মনের বিষয় ও আত্মা একত্র হইলে, মনের চেষ্টা নির্ব্বাহিত হয়। মনঃ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় উভয়াত্মক, মনের অধীনে ইন্দ্রিয়গণের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। এস্থলে মনটী আত্মা-সংযুক্ত, নচেৎ মন অচেতন। বোধের অভাব নিদ্রা, নিদ্রায় যে বোধের অভাব হয়, সে সমস্তই বাহেন্দ্রিয়গণের বোধের অভাব। নিরিন্দ্রিয় প্রদেশের মনের অধিষ্ঠানকে নিদ্রা বলে। অন্তরীন্দ্রিয়-মনের বোধের অভাব হয় না। কারণ নিদ্রিতাবস্থায় আত্মা মনের সাহায্যে বিষয় সকল গ্রহণ করিয়া অপরিচিতের ন্যায় ধৃতি, স্মৃতি, জ্ঞান, বিজ্ঞান প্রভৃতি যুক্ত হইয়া সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। বাহেন্দ্রিয় গণের অন্তরীন্দ্রিয় মনের সহিত অযোগই নিদ্রা। এই অযোগের কারণ তমো বা অন্য নৈসর্গীক কারণ। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে হৃদয়ই নিদ্রার স্থান ;

"পুণ্ডরীকেন সদৃশং হৃদয়ং স্যাদধো মুখং।
জাগ্রত স্তদ্বিকশতি স্বপতশ্চ নিমীলতি॥"

হৃদয়ের আকার পদ্মমুকুলের ন্যায়, উহা অধোমুখে থাকে, উহা জাগ্রত অবস্থায় প্রস্ফুটিত এবং নিদ্রিতাবস্থায় নিমীলিত থাকে। সেই হৃদয়ই চেতনার স্থান, তাহা তমোগুণে আবৃত হইলে সর্ব্বপ্রাণী নিদ্রিত হয়।

মহর্ষি সুশ্রুত বলিয়াছেন :—

"হৃদয়ং চেতনা স্থান মুক্তং সুশ্রুত দেহিনাং।
তমো'ভিভূতে তস্মিংশ্চ নিদ্রা বিশতি দেহিনাম্॥
নিদ্রাহেতুস্তমঃ সত্বং বোধনে হেতুরুচ্যতে।
স্বভাব এব বা হেতুর্গরীয়ান্ পরিকীর্ত্ত্যতে।"

যে সুশ্রুত সংহিতায় হৃদয়ই চেতনায় স্থান উক্ত হইয়াছে, সেই হৃদয়ে তমোগুণ অভিভূত হইলে নিদ্রা প্রাণীদিগের শরীরে আবিষ্ট হয়। তমোগুণ নিদ্রার হেতু (তমো মোহ বা আবরক গুণ, তমো চেতনাকে বা সত্ত্বগুণকে মুগ্ধ বা আবৃত করে) এবং সত্ত্বগুণ জাগরণের হেতু (সত্ত্বগুণই চেতনা) অথবা নিদ্রা বা জাগরণের মুখ্য কারণ স্বভাবই বলা যাইতে পারে।

মহর্ষি চরক বলিয়াছেন :—

ষড়ঙ্গমঙ্গ বিজ্ঞান মিন্দ্রিয়াণ্যর্থ পঞ্চকং।
আত্মাচ মগুণশ্চেতি চিন্ত্যঞ্চ হৃদসংশ্রিতম॥

দুই হস্ত, দুই পাদ, মধ্যদেহ ও মস্তক এই ছয়টি লইয়া মানব দেহ। চক্ষু কর্ণাদি পঞ্চবুদ্ধীন্দ্রিয় রূপরসমাদি পঞ্চইন্দ্রিয়ার্থ, স্বগুণ আত্মা ও চেতঃ হৃদয় ইহাদের আশ্রয় স্থান। যেমন ঘরের চাল প্রভৃতির আশ্রয় আড়া, সেইরূপ হৃদয় উক্ত দ্রব্য সমূহের আশ্রয় স্থান। যদ্দারা

স্পর্শজ্ঞান জন্মিয়া থাকে, তাহা হৃদয়ে আশ্রিত। হৃদয়ই ওজঃধাতু বা বলের প্রশস্ত স্থান। হৃদয়ই চৈতন্যের আশ্রয়। এই চেতনা-স্থান হৃদয় যখনি শ্লেষ্মার দ্বারা অভিভূত হয়, তখন প্রাণিগণ নিদ্রা যায়। এই শ্লেষ্মা বুদ্ধির অবরোধ জন্মাইয়া প্রাণিগণের নিদ্রা উৎপন্ন করে। নিদ্রা বা জাগরণ হৃদয়ের ঘাত-প্রতিঘাত ব্যতীত অন্য কিছুই নয়।

তমোগুণবশে ইন্দ্রিয়গণ বিকলতা প্রাপ্ত হইলে, অনিদ্রিত যে ভূতাত্মা তাহাকে নিদ্রিতের ন্যায় উপলব্ধি হয়। জীব, নিদ্রা গেলে কর্ম্মীপুরুষ তাহার উপর কর্ত্তৃত্ব করে। এক কথায় ইন্দ্রিয় জ্ঞান হইতে বিচ্ছিন্নতাই নিদ্রা।

যখন জীব নিদ্রা যায়, তখন কর্ম্মীপুরুষ শুধু যে তাহার উপর কর্ত্তৃত্ব করেন তাহাই নহে, রজোযুক্ত মনের দ্বারা পূর্ব্বদেহ অনুভূত বা শুভাশুভ বিষয় সকলও গ্রহণ করিয়া থাকেন।

যেমন সত্ত্ব জাগরণের কারণ, এবং সত্ত্ববিচ্যুত তমো নিদ্রার কারণ, তদ্রূপ সত্ত্ববিচ্যুত রজোযুক্ত মনঃই স্বপ্নের কারণ। জাগরিত অবস্থা ব্যতীত অন্য কোন সময় মনের সহিত সত্ত্বের সংযোগ হয় না। জাগরণের অবস্থায় মনঃ যদি রজোযুক্ত হয়,—তবে কাম, ক্রোধ, মান, দম্ভ, অহঙ্কার প্রভৃতি জীব-দেহে সঞ্চরণ করে, এবং যদি তমোযুক্ত হয়, তবে বুদ্ধিভ্রংশ অজ্ঞানতা আসিয়া জীবদেহে প্রকটিত হয়। মানবজীবন—জাগরণ, নিদ্রা ও স্বপ্নময়।

এইবার আমরা স্বপ্ন সম্বন্ধে কিছু বলিব।

বাতিক প্রকৃতির লোকে স্বপ্নে আকাশে গমন করে, যেন উচ্চস্থান হইতে পতিত হইতেছে মনে করে। কারণ বায়ু চলগুণ বিশিষ্ট।

পৈত্তিকপ্রকৃতির ব্যক্তি স্বপ্নে স্বর্ণ বা নাগকেশর, পলাশ, কর্ণিকায়, অগ্নি, বিদ্যুৎ, উল্কা প্রভৃতি আগ্নেয় গুণবিশিষ্ট বিষয় দর্শন করিয়া থাকে। কারণ পিত্ত তৈজস পদার্থ।

শ্লৈষ্মিক প্রকৃতির লোকে স্বপ্নে পদ্ম, হংস, চক্রবাক যুক্ত মনোজ্ঞ জলাশয়াদি দর্শন করিয়া থাকে। কারণ শ্লেষ্মা সৌম্য বস্তু। যাহা হউক উল্লিখিত প্রাকৃতিক স্বপ্ন সকল কোনরূপ ইষ্টানিষ্টের কারণ হয় না।

ইহা ভিন্ন, কতকগুলি শুভাশুভের ভবিষ্যৎ জ্ঞাপক স্বপ্ন আছে। সুহৃৎগণ বা স্বয়ং সেই স্বপ্ন দেখিলে, শুভ বা মরণ হয়। যেমন দেবতা ব্রাহ্মণ, গো, বৃষভ, জীবিত সুহৃৎ, নৃপ, অগ্নি, মাংস, মৎস্য, শ্বেতবর্ণ মালা, শ্বেতবস্ত্র, ফল, নির্ম্মল জল, প্রাসাদ, বৃক্ষ, হস্তী, পর্ব্বতে আরোহণ প্রভৃতি স্বপ্নে দেখিলে, কল্যাণ লাভ এবং ব্যাধির উপশম হয়, এবং কার্পাস, তৈল, তিল লবণ ও ধাতুলাভ, মৎস্যে গ্রাস করা, পর্ব্বতাগ্র হইতে পতিত—কাক, চিতায় আরোহণ প্রদীপ নির্ব্বাণ, দেবতা নাশ, স্রোতে বাহিত হওয়া, প্রেতের সহিত বাক্য-কথন, পক্ব অন্ন ভক্ষণ বা সুরা, মধু ও তৈল পান, পঙ্কে নিমগ্ন হওয়া, মালা বা তারকাদির পতন, শ্বাপদগণ কর্ত্তৃক মস্তকে রক্ত আঘ্রাণ, মুণ্ডিত মস্তক হওয়া প্রভৃতি স্বপ্নে দেখিলে সুস্থের ব্যাধি ও ব্যাধিতের মৃত্যু হয়। ইহা আমরা অনেক স্থলে প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

যাহা পূর্ব্বদৃষ্টকৃত বা চিন্তিতপূর্ব্ব নয়, যাহা ইষ্টানিষ্ট সূচক নয় এবং যাহা স্বভাবানুযায়ী নয়—এইরূপ উদ্ভট অচিন্ত্যপূর্ব্ব স্বপ্ন সকলই পূর্ব্বদেহানুভূত স্বপ্ন।

শুভাশুভ স্বপ্ন দেখিলেই যে ইষ্ট বা অনিষ্টের কারণ হয়, তাহা নহে, শাস্ত্রে উক্ত আছে;—

"যথাস্বং প্রকৃতি-স্বপ্নো বিস্মৃতো বিহতশ্চ যঃ।
চিন্তাকৃতো দিবাদৃষ্টো ভবন্ত্যফলদাস্ততে॥"

যদি স্বপ্ন আপনার স্বভাবানুযায়ী হয় অথবা যদি স্বপ্ন দৃষ্ট হইবার পর তাহা বিস্মৃত হওয়া যায় অথবা অশুভ স্বপ্ন দৃষ্ট হইবার পর পুনরায় শুভ স্বপ্ন দৃষ্ট হয় কিম্বা যদি স্বপ্ন চিন্তা-কৃত বা দিবা দৃষ্ট হয়, তবে নিস্ফল হইয়া থাকে।

রাত্রির প্রথম প্রহরে দুঃস্বপ্ন দেখিলে শুভচিন্তা করিতে করিতে পুনরায় নিদ্রা যাওয়া উচিত। অশুভ স্বপ্ন দেখিলে কাহাকেও প্রকাশ করিবে না, দেবতা গৃহে ত্রিরাত্র বাস করিবে। আর বিপ্রদিগের পূজা করিলেও দুঃস্বপ্ন হইতে মুক্ত হওয়া যায়। দুঃস্বপ্ন দৃষ্ট হইলে প্রভাতে উঠিয়া বিপ্রদিগকে মাষ, তিল, ধাতু ও স্বর্ণদান করিবে এবং শুভমন্ত্রসমূহ ও গায়ত্রী জপ করিবে।

নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন দেখা যায় বলিয়া স্বপ্নকে নিদ্রার রূপান্তর বলা যাইতে পারে। স্বপ্নে আমাদের যথার্থ বোধ বা জাগরণ হয় না—অথচ হেতু ও কর্ম্ম দ্বারা শুভাশুভ স্বপ্নের ইষ্টানিষ্ট ফল সকল আমরা ভোগ করিয়া থাকি। ইহাই কর্ম্মীপুরুষের জীব-দেহের উপর কর্ত্তৃত্ব। ইহা দ্বারা প্রমাণ হয়, আত্মা নিদ্রার আয়ত্ত নয়। কিন্তু ইন্দ্রিয়গণ মনো-যোগের অভাবে ক্রিয়া হীন হইয়াও বিষয় সকল গ্রহণ করে না,—ইহা দ্বারা চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণের অচৈতন্যত্ব প্রমাণ হয়। ভূতাত্মাকে চেতন আত্মার সাহচার্য্য হেতু মনের চৈতন্য বলা যাইতে পারে।

মহর্ষি চরক নিদ্রালক্ষণে বলিয়াছেন :—
"যদা তু মনসি ক্লান্তে কর্ম্মাত্মানঃ ক্লমান্বিতাঃ।
বিষয়েভ্যো নিবর্ত্তন্তে তদা স্বপিতি মানবঃ॥"

যখন মানগণের মনঃ, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানে-ন্দ্রিয় (একাদশ ইন্দ্রিয়) বিভ্রান্তভাব অব-লম্বন করে এবং সমস্ত বিষয়-কর্ম্মে নিবৃত্ত হয়, তখন তাহাকে নিদ্রাভিভূত জানিবে।

স্বপ্ন ও ভ্রম উভয়েই রজোগুণ হইতে উৎপন্ন হয়। স্বপ্ন সুনিদ্রার ব্যাঘাত করে। অতএব স্বাস্থ্য রক্ষায় যত্নশীল ব্যক্তিগণ যাহাতে স্বকৃত বা চিন্ত-প্রসূত স্বপ্ন সকল উপস্থিত হইয়া সুনিদ্রার ব্যাঘাত জন্মাইতে না পারে, তজ্জন্য যত্নপর হইবেন।

কবিরাজ শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ সেন।

সদ্বৃত্ত।

—:*:—

উপক্রমণীয়াধ্যায়।

যাহার শরীরে বায়ু-পিত্ত-কফ, কায়াগ্নি এবং জঠরানল স্বস্থানে, স্বমানে, স্বভাবে রহিয়া স্বস্বকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে থাকে, রস-রক্তাদি ধাতুব্যূহ স্বভাব-ভ্রষ্ট ও দোষ-দুষ্ট না হইয়া শরীরের পুষ্টি এবং মনের তুষ্টি বিধান করে, আহার পরিপাকান্তে অসার পার্থিবাংশ মলরূপে এবং জলীয়াংশ মূত্ররূপে পরিণত হই-বার বাধা না ঘটে; সঞ্জাত মলমূত্র, শরীরের

বিশীর্ণ বিধ্বস্ত তন্তুকী প্রভৃতি অবাধে মলায়ন পথদিয়া বাহির হইয়া যায়, রক্ত-সঞ্চলন-শ্বাস প্রশ্বাস প্রভৃতি শারীর-ক্রিয়া অবাধে চলিতে থাকে, পরন্তু আত্মা মনঃ এবং ইন্দ্রিয়-গ্রাম সুপ্রসন্ন রহিয়া পরম মঙ্গল বিধান করে, তাহাকে স্বস্থ বলে। স্বস্থ-ব্যক্তি ভাবের নাম স্বাস্থ্য বা আরোগ্যের অপর নাম সুখ।

সুখের কামনা স্বাভাবিকী, সকলেই সুখের কামনা করে ; দুঃখ-ভোগ কাহারও অভীপ্সিত নহে। সুখের জন্য প্রাণি সকল প্রাণ-পণ করিয়া মনঃ, বুদ্ধি এবং শরীর পরিচালনা করত নানা প্রকার কাজ করে। তথাপি কেহই দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না। ত্রিবিধ দুঃখ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক—বাহু প্রসারণ করিয়া প্রাণিগণকে আলিঙ্গন করিবার জন্য সতত উদ্যুক্ত রহিয়াছে। দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায় কি? ঐকান্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি বা মুক্তির কথা বলিতেছি না। মুক্তি যোগি জনের ভাগ্যে ঘটিতে পারে, সাধারণের অদৃষ্টে ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। কি করিলে দুঃখের অল্পতা ঘটে অর্থাৎ কিরূপ কাজ করিলে সকলে অরোগ শরীরে প্রফুল্ল অন্তঃকরণে সুখায়ুঃ উপভোগ করিতে সমর্থ হন তাহারই কথা হইতেছে।

সত্যবটে—

"সুখার্থাঃ সর্ব্বভূতানাং মতাঃ সর্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ।

কিন্তু—

সুখঞ্চ ন বিনা ধর্ম্মাৎ তস্মাদ্ ধর্ম্ম-পরো ভবেৎ॥"

ধর্ম্মভিন্ন সুখ হয় না, সুখী হইতে হইলে ধর্ম্মাচরণ করিতে হয়।

ধর্ম্ম না বুঝিলে, ধর্ম্মাচরণ সম্ভবপর নহে। ধর্ম্মাচরণ না করিলে সুখাবাপ্তি এবং দুঃখ হানির সম্ভাবনা নাই। তজ্জন্য ধর্ম্ম কি, তাহা বিশেষরূপে হৃদঙ্গম করিয়া ধর্ম্ম-পথাবলম্বন করত সুখায়ুঃ উপভোগ করিবার চেষ্টা করা মনুষ্যমাত্রেরই সর্ব্বাগ্রগণ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

ধর্ম্ম কাহাকে বলে? এ প্রশ্নের উত্তর অল্প কথায় দেওয়া যায় না। বহু কথা বলিয়াও ধর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহা বুঝাইয়া দেওয়া যায় কি না, তাহা আমরা বলিতে পারি না। মহাপ্রাজ্ঞ মহাভারতকার যুধিষ্ঠিরের মুখদিয়া বকরূপী ধর্ম্মের নিকট বলাইয়াছেন—"ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং"। যখন দেবকল্প ব্যাসদেবের বিবেচনায় ধর্ম্মতত্ত্ব দুরধিগম্য, তখন ধর্ম্মের লক্ষণ নির্দ্দেশ করা সম্ভবপর কি না তাহা বলা যায় না।

তবে উচ্চার্য্যমান শব্দ মাত্রেই প্রকৃতি-মূলক। ধর্ম্ম শব্দের মূলেও একটী প্রকৃতি রহিয়াছে। সে প্রকৃতি 'ধৃ' ধাতুর। ধৃ ধাতুর অর্থ ধারণ করা। তদুত্তর কর্ত্তৃ-বাচ্যে 'ম' প্রত্যয় বিধান করিলে ধর্ম্ম শব্দ নিষ্পন্ন হয়। "ধরতীতি ধর্ম্মঃ।' অর্থাৎ যে ধারণ করে, তাহার নাম ধর্ম্ম। নিরুক্তিও লক্ষণের মধ্যে পরিগণিত। উক্ত নিরুক্তি বা ব্যুৎপত্তি অনুসারে বুঝিলাম—যে ধারণ করে সেই ধর্ম্ম। এটী ধর্ম্মের ব্যাপক লক্ষণ, কুত্রাপি ইহার ব্যভিচার নাই। সমস্ত জগৎ এবং জগতের চেতনাচেতন পদার্থ সমূহ ধারণাত্মক ধর্ম্মাধীন। সেই ধর্ম্ম বলে সমস্তই বিধৃত হইয়া সুস্থিত রহিয়াছে। ধর্ম্ম-হীন হইলেই সমস্তই বিধ্বস্ত হইয়া যায়। সৃষ্টি কালে বিধাতৃ-বিধানুসারে সৃজ্যমান পদার্থের উপাদান সকল যেমন-যেমন ভাবে সমবেত হইতে থাকে, ধারণাত্মক ধর্ম্ম সেই গুলি সেই-সেই রূপ ভাবে ধারণ করিয়া

রাখিতে থাকে। ধর্ম্মই স্থিতি কালের সুস্থিরতা বিধান করে। বিনাশ কালে বিশ্লিষ্ট উপাদান লইয়া, যাহা যাহার নিকট হইতে আসিয়াছিল, তাহা তাহার অঙ্গে মিশাইয়া ধরিয়া রাখিতে থাকে; কিছুই নষ্ট হইতে দেয় না। ধর্ম্ম সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে বিদ্যমান রহিয়া জগৎ ধারণ করিয়া রাখিয়াছে।

ধর্ম্মের আরও অনেক ব্যাপ্যার্থ আছে, দুই একটীর উল্লেখ করিতেছি। অতি অল্প সংখ্যক লোক ছাড়া পৃথিবীর সকল মনুষ্যই জানেন যে, এ জগতের একজন স্রষ্টা এবং বিধাতা আছেন। অনেকে পরলোকও স্বীকার করেন। যাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন এবং পরলোক মানিয়া চলেন, তাঁহাদিগকে আস্তিক বলে। আস্তিকেরা ইহকালের মঙ্গলের জন্য এবং পরকালের কল্যাণের নিমিত্ত স্রষ্টার অর্চ্চনা করেন এবং বিধাতৃ-বিধান জ্ঞান করিয়া শাস্ত্র বিশেষ মানিয়া চলেন। দেবারাধনা এবং-শাস্ত্র বিশেষের মত অনুসরণ করিয়া চলার নামও ধর্ম্ম। পৃথিবীতে বহু ধর্ম্মমত প্রচলিত আছে। যেমন হিন্দু ধর্ম্ম, মুসলমান ধর্ম্ম এবং খৃষ্টধর্ম্ম প্রভৃতি।

ভগবান্ মনু বলেন,—বেদ-স্মৃতি সদাচার আপনার আত্মার প্রিয় ধর্ম্মের লক্ষণ। অন্যত্র বলিয়াছেন—ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য এবং অক্রোধ—এই দশটী ধর্ম্মের লক্ষণ।

ধর্ম্মের আরও অনেক প্রকার অর্থ প্রচলিত আছে। যেমন চোরের ধর্ম্ম চুরি করা, আগুণের ধর্ম্ম দাহ করা, চুম্বকের ধর্ম্ম লৌহ আকর্ষণ করা—ইত্যাদি। তত কথায় আমাদের প্রয়োজন নাই। যাহা পালন করিলে পৃথিবীর নর-নারীগণ হিতায়ুঃ এবং সুখায়ুঃ উপভোগ করিতে পারেন, তাহাই আমাদের প্রস্তুত বিষয়। সেই ধর্ম্মের নাম সদ্বৃত্ত।

কোন্ কোন্ সদ্বৃত্ত পালন করিলে সুখ বা আরোগ্য লাভ করা যায়, তাহা জানা দুর্ঘট নহে। এখনও আমাদের দেশে প্রাচীন কালের বেদ, স্মৃতি, তন্ত্র, পুরাণ, ইতিহাস, নীতিশাস্ত্র, কাব্য, কথাগ্রন্থ এবং চিকিৎসা শাস্ত্র প্রভৃতি রাশি রাশি গ্রন্থ বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই সকল গ্রন্থে সে কালের ঋষি এবং ঋষিকল্প মনীষীগণ নানাছলে অনুষ্ঠেয় সদ্বৃত্ত সমস্তের উপদেশ দিতে কৃপণতা করেন নাই। তার পর বর্ত্তমান সময়ে আমরা নানা দিগ্‌দেশ হইতে আনীত ধর্ম্মগ্রন্থ, নীতিগ্রন্থ এবং নানাবিধ জ্ঞান বিজ্ঞানের বহুগ্রন্থ পড়িবার সুযোগ পাইয়াছি। মনোনিবেশ পূর্ব্বক সেই সকল গ্রন্থ পড়িলে বা তাহার মর্ম্মার্থ শ্রবণ করিলে সমস্ত সদ্বৃত্ত জানা যাইতে পারে। তাই বলিতেছিলাম, যে সকল সদ্বৃত্ত পালন করিলে শারীরিক মানসিক স্বাস্থ্য লাভ করা যায়, তাহা অবগত হওয়া অসম্ভব পর নহে, নানা কারণে বর্ত্তমান সময়ে সদ্বৃত্ত পালন করাই দুর্ঘট হইয়া উঠিয়াছে।

যে সকল কারণে আমরা সদ্বৃত্ত পালনে অনভ্যস্ত হইয়া অসদাচার-পরায়ণ হইয়া উঠিয়াছি, সেই সকল কারণের মধ্যে শিক্ষা-বিপর্য্যয়ই মুখ্য কারণ। পূর্ব্বে আমাদের দেশে বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রচলন ছিল। হয়ত শূদ্রবর্ণের শিক্ষা সম্বন্ধে তাদৃশ কঠোর নিয়ম না থাকিতে পারে; কিন্তু দ্বিজবর্ণের—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য জাতির সন্তানগণকে বাধ্য করিয়া বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া হইত। উপনয়ন সংস্কারের অপরিহার্য্যতাই তাহার প্রকৃষ্ট

প্রমাণ। এখন যেমন প্রাবেশিক শুল্ক বা এড্‌মিশন্ ফি দিলেই বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হওয়া যায়, তখন বিদ্যামন্দিরে প্রবেশের পথ সেরূপ সুগম ছিল না। সে সময়ে উপনীত হইয়া কতকগুলি সদাচার পরিপালনে রত রহিয়া, গুরুগৃহে দীর্ঘকাল বাস করত বিদ্যাভ্যাস করিতে হইত।

বালকের নির্দ্দিষ্ট শিক্ষাকাল উপস্থিত হইলেই তাহাকে আচার্য্য-গুরুর নিকট অর্পণ করা হইত। আচার্য্য মানবকের সংস্কার বিধান করিয়া, শিষ্যকে বহু নিয়মে বাধ্য রাখিয়া শিক্ষাদানে প্রবৃত্ত হইতেন। উপনীত মানবক গুরুর অনুশাসনে ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন করতঃ কাম, ক্রোধ, মান, অহঙ্কার, লোভ, মোহ, ঈর্ষা, পারুষ্য, অনৃত এবং আলস্য প্রভৃতি পরিহার পূর্ব্বক গুরুগৃহে রহিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতেন। দীর্ঘকাল-ব্যাপি-যম-নিয়মে নিয়মিত ব্রহ্মচারিগণের শরীর যথোচিত উপচিত এবং বলিষ্ঠ হইত। অনুশীলনে মনোবৃত্তি স্ফূর্ত্তি লাভ করিত এবং বিদ্যাভ্যাসে বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত হইত। তাহার পর তাহারা সদাচারে অভ্যস্ত হইয়া এবং মনুষ্যত্বলাভ করিয়া গৃহ-ধর্ম্ম আচরণের জন্য গৃহে ফিরিয়া আসিতেন।

সে সময়ে গৃহস্থাশ্রম প্রেম-ধর্ম্ম উপার্জ্জনের আশ্রম ছিল। গৃহস্থ হইয়া গৃহিগণ ধর্ম্মাচরণের জন্য ধর্ম্ম-পত্নী গ্রহণ করিতেন তাঁহারা গুরুজনে ভক্তি, বন্ধুজনে সৌখ্য, সন্তানকল্প জনে বাৎসল্য, আর্ত্তজনে দয়া, প্রভুজনে দাস্য, ভার্য্যায় মাধ্বীকতা এবং গৃহাগত জনে পরম প্রীতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া প্রেম-ধর্ম্মের সাধনা করিতেন। মনঃ যখন বিশ্বজনীন প্রেমপূর্ণ হইয়া উঠিত, তখন গৃহস্থগণ গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক আশ্রমান্তর আশ্রয় করিতেন।

বহুকাল হইল ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম উঠিয়া গিয়াছে। শিক্ষার গতিও ফিরিয়াছে। বদ্ধবদ্ দেশাচার এবং লোকাচারের খাতিরে উপনয়ন সংস্কারটা আজিও সম্যক্ লোপ পায় নাই। ব্রাহ্মণ সন্তানকে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতেই হয়, অন্যান্য দ্বিজবর্ণের মধ্যে উপনয়ন সংস্কারের গোলোযোগ ঘটিয়াছে। বলা বাহুল্য যে, অধুনা বিদ্যাশিক্ষার অধিকারের আশায় কাহাকেও উপনীত হইয়া ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিতে হয় না। এখন প্রাবেশিক শুল্ক বা এড্‌মিশন্ ফি দিলেই যে কেহ কোন বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইতে পারেন।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম-ভ্রংশের এবং সদ্বৃত্তের অননুষ্ঠানের দ্বিতীয় কারণ যুগ-বিপর্য্যয়। কথিত আছে—

"সত্যং ত্রেতা যুগঞ্চৈব দ্বাপরং কলিরেবচ।
রাজ্ঞোবৃত্তানি সর্ব্বাণি রাজাহি যুগমুচ্যতে॥"

বস্তুতঃ রাজাই যুগের প্রবর্ত্তক। দীর্ঘকাল যাবৎ ভারতবর্ষে নানা জাতীয় অহিন্দু-রাজগণ রাজত্ব করিয়া আসিতেছেন। যখন যিনি রাজা হইয়াছেন, তখন তিনি প্রকৃতিপুঞ্জকে স্বকীয় ধর্ম্ম এবং স্বজাতীয় আচরণ শিক্ষা দিতে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছেন। সত্য বটে, কোন রাজাই সম্যক্‌প্রকারে সমাজবিজয় করিতে পারেন নাই, কিন্তু রাজপ্রভাব একেবারে ব্যর্থ হয় নাই। যুগে যুগে ভারতবাসীরা বিদেশী ভাব অনুকরণ করিয়া আসিতেছেন এবং ক্রমশঃ দেশকালোপযোগী সদাচার-ভ্রষ্ট হইতেছেন।

যুগ-চক্রে ঘুরিয়া-ফিরিয়া ভারতের হিন্দুগণ এক অতিভীষণ যুগান্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সে সময়ের ন্যায় দুঃসময় এদেশে আর কখন উপস্থিত হয় নাই। যে সময়ে

মুসলমান রাজার হাত হইতে রাজদণ্ড স্খলিত-প্রায় অথচ ইংরেজ রাজ্য পত্তন হয় নাই, —সেই সময়ের কথা বলিতেছি। সত্য বটে, সে সময়েও ভারতবর্ষে অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনার প্রথা সম্যক্ লোপ পায় নাই। স্থানে স্থানে প্রাথমিক পাঠশালা স্থাপিত ছিল, স্থান-বিশেষে নানা শাস্ত্র অধ্যাপনার জন্য চতুষ্পাঠীও প্রতিষ্ঠিত ছিল; কোন কোন স্থানে মৌলবীরা পাঠশালা স্থাপন করিয়া আরবী, পার্শী এবং উর্দ্দু ভাষা শিক্ষা দিতেন। কিন্তু সে সময়ে মনুষ্যত্ব লাভের জন্য কেহ কিছু শিখিতেননা; উপার্জ্জনক্ষম হইবার জন্যই লেখা পড়া শিখিবার প্রয়োজন হইত। আর এক কথা, সে সময়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত জনের সংখ্যা দেশের তদানীন্তন জনসংখ্যার তুলনায় অল্পই ছিল,—হাজার ভাগের এক ভাগ ছিল কিনা, তাহাও সন্দেহস্থল। তখন দেশ অজ্ঞানান্ধ-তমসাচ্ছন্ন হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ত্রিকালদর্শী-মহর্ষিগণ, দূর ভবিষ্যতে দেশের যে এরূপ দুর্দ্দশা উপস্থিত হইবে, তাহা বুঝিয়া, বেদ-বিহীন জনসাধারণের শিক্ষার জন্য পুরাণ, ইতিহাস, এবং তন্ত্র প্রভৃতি নানাশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। বেদার্থের অবিপরীত তত্তৎ শাস্ত্রের উপদেশ যাহাতে এ দেশের নরনারী সকলের হৃদয়ে স্থায়ী আস্পদ লাভ করে, পরবর্ত্তি-মনীষীগণ তজ্জন্য যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছিলেন। সর্ব্বশেষে স্মার্ত্ত-শিরোমণি রঘুনন্দন হিন্দু সমাজটাকে কর্ম্মপাশে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য অষ্টাবিংশতি তত্ত্বাত্মক নব্য-স্মৃতি প্রণয়ন করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের যত্ন একাণ্ড নিষ্ফল হয় নাই; তবে যুগপ্রভাবে সম্যক্ সাফল্য-লাভও করিতে পারে নাই। শাস্ত্রানুশাসন ছিল বলিয়া হিন্দুসমাজ কোরাণ, কৃপাণপাণি মুসলমান ধর্ম্মপ্রচারকের বশবর্ত্তী না হইয়া এবং অন্ধকার হইতে আলোকে যাইবার লোভ সম্বরণ করিয়া স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করত আপনার বিরাট দেহ বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। শাস্ত্রানুশাসন-ভীতি না থাকিলে এতদিন হিন্দু নর-নারী অন্যান্য সম্প্রদায়ের অঙ্গীভূত হইয়া যাইত, হিন্দুর অস্তিত্ব লোপ পাইত। সত্য বটে, শাস্ত্রানুশাসন ভয়েই হিন্দুর দেশে বর্ণ-বিচার ছিল এবং দশবিধ সংস্কারের মধ্যে কোন কোন সংস্কার, শৌচাচার, সন্ধ্যাবন্দনা, দেবার্চ্চনা, শ্রাদ্ধ-তর্পণ, অতিথি-পোষণ প্রভৃতি শাস্ত্রাদিষ্ট কর্ম্মগুলি অনুষ্ঠিত হইত। কিন্তু কিছুই নির্দ্দোষ ছিল না।

বর্ণ-বিচার ছিল—ভালই ছিল। তবে বর্ণ-বিচারের বড় বাড়াবাড়ি হইয়াছিল। তজ্জন্য নীচজাতীয় অনেক লোক, মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণ করিয়া, উচ্চজাতীয় লোকের অত্যাচারের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিল। শুধু নিষ্কৃতি লাভ করিয়াই তাহারা নিশ্চিন্ত রহে নাই; সময়ে সময়ে হিন্দু জাতির উপর অত্যাচারও করিত। তজ্জন্য এ দেশে বিষম মুসলমান-ভীতি উপস্থিত হইয়াছিল। সে সকল কথা এবং সংস্কার প্রভৃতির দোষের কথা সকলেরই জানা আছে, লিপি-বাহুল্যের প্রয়োজন নাই। ফল কথা এই যে, মুসলমান রাজত্বের অবসানকালে হিন্দুর সমাজ ছিল বটে কিন্তু হিন্দুত্ব কলুষিত হইয়া পড়িয়াছিল।

তাহার পর, যে সময়ে মুসলমানের রাজত্ব যায়-যায় হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সময়ে ইংরেজ, বণিক্ সম্প্রদায় এ দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়া, বাণিজ্য ব্যপদেশে বহুধন উপার্জ্জন এবং সঞ্চয় করিতেছিলেন টাকার সঙ্গে সঙ্গে বল-সঞ্চয়ও হইতেছিল। ধনে-জনে এবং বুদ্ধি-বলে বলীয়ান্

ইংরেজ হৃদয়ে রাজ্যলাভের আশার সঞ্চার হইল। ভাগলক্ষ্মীর কৃপায় মুসলমান রাজার হাত হইতে স্খলিতপ্রায় রাজদণ্ড ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি-হস্তগত করিলেন। তখন ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বঙ্গদেশে আর এক নূতন যুগ প্রবর্ত্তিত হইল। এ যুগের প্রথম ভাগটা ভারতবাসীর পক্ষে ভাল গেলনা। কিছুকাল পরে, ভারতের সৌভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপায় ইংরেজ রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে, রাজপুরুষেরা নানা দুষ্কৃতি-দমনে ব্যাপৃত রহিলেন এবং প্রকৃতিপুঞ্জকে জ্ঞান-বিজ্ঞান শিখাইবার সুবন্দোবস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন বাঙ্গালাদেশে অতি অল্পসংখ্যক ব্রাহ্মণ-বালক এবং তদপেক্ষা আরও অল্পসংখ্যক বৈদ্যবালক চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ এবং শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিতেন। অন্যান্য বর্ণের উচ্চশিক্ষার উপায় ছিল না। অতি অকিঞ্চিৎকর প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়া বা না করিয়া তাহাদিগকে সংসারের কাজে ব্যাপৃত হইতে হইত। ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত বিদ্যামন্দিরের দ্বার সাধারণের জন্য উন্মুক্ত রহিল অর্থাৎ জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে বিদ্যাদানের ব্যবস্থা হইল। পাশ্চাত্য জ্ঞানালোকে তদানীন্তন ভারতের অজ্ঞানান্ধকার ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া আসিতে লাগিল।

সদাশয় ইংরেজের কৃপায় এদেশে বহুজ্ঞানের আকর ইংরেজী বিদ্যা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইল বটে, কিন্তু শিক্ষার্থী-বালকগণকে ব্রহ্মচর্য্যাদি সদ্বৃত্ত পালনে বাধ্য রাখিয়া শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইল না। এ ত্রুটি অবশ্য ইংরেজের নহে। তাঁহারা বিদেশাগত। সদ্বৃত্ত ভ্রষ্ট হইয়া এদেশের লোক কতদূর অধঃপতনের সোপানে নামিয়া পড়িয়াছে হয় ত তাহা তাঁহারা জানিতেন না। আর পূর্ব্বকালের আচার্য্যেরা শিষ্যদিগকে কিরূপ নিয়মে আবদ্ধ রাখিয়া বিদ্যাদান করত মানুষ করিয়া দিতেন, সে তত্ত্বও জানিবার সুযোগ তখন তাঁহাদের হয় নাই। যে সময়ে ইংরেজেরা এ দেশে শিক্ষা বিস্তারের সূত্রপাত করেন, সে সময়ে এদেশে বুদ্ধিমান্, জ্ঞানবান্ এবং ক্ষমতাশালী লোকও ছিলেন। ইংরেজের সহিত তাঁহাদের ঘনিষ্ঠতাও ছিল। তাঁহারা যদি ব্রহ্মচর্য্যাদি সদাচারে বাধ্য রাখিয়া বালকদিগকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে পরামর্শ দিতেন, তাহা হইলে সেকালের সদাশয় ইংরেজ সম্ভবতঃ সে পরামর্শ শুনিতেন এবং পরামর্শানুরূপ কাজও করিতেন।

বর্ত্তমান সময়ে সদ্বৃত্তভ্রষ্ট অথচ কঠোর অধ্যয়নেরত কিশোর এবং যুবকগণের শারীরিক এবং মানসিক দুর্দ্দশা দেখিলে মনে হয়, শিক্ষার সুফল কে ভোগ করিবে? আর মনে হয় কি করিলে যেমন ছিল তেমনি হয়? কিন্তু সুদীর্ঘ কালের পর এরূপ চিন্তা সুফলপ্রসূ হইবে বলিয়া মনে হয় না।

যে সময়ে ভারতবর্ষ কান্তারভূয়িষ্ট প্রান্তরবহুল, বিমলজলপূর্ণ-সরিৎসরোবরসুলভ এবং বিরল-জনপদ ছিল; যখন গোসর্গে প্রচুর দুগ্ধ দান করিয়া কান্তারে প্রান্তরে চরিয়া-ফিরিয়া গোধূলিসময়ে ভুক্ত-পীত-হৃষ্টপুষ্ট ঘটোঘ্নী গাভীর পাল স্ব স্ব অধিপতির গৃহে ফিরিয়া আসিত; যখন পরিচ্ছদের পারিপাট্য লোকে বুঝিত না; অতি অকিঞ্চিৎকর-বসনে লজ্জা নিবারণ এবং শীতত্রাণ করিতে কেহ লজ্জা বোধ করিতনা বা নিন্দাভাজন হইত না, সংক্ষেপতঃ যে দেশে অন্নবস্ত্রের দায় এবং বিলাসপ্রিয়তা ছিল না, সেই দেশে সেই

সময়ে সর্ব্বমঙ্গল-মঙ্গল্য ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠা ছিল। তদানীন্তন ব্রাহ্মণগণ নিশ্চিন্তমনে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং প্রণয়ন করিতেন এবং সমাগত শিষ্যদিগকে অন্নদানাদি দ্বারা পোষণ করিয়া কুলপতি উপাধি লাভ করত ধন্যমনা হইতেন।

সে দেশ নাই, সে কালও গত হইয়াছে। এখন আর উঞ্ছবৃত্তি এবং সৎপ্রতিগ্রহ প্রভৃতি উপায় অবলম্বন করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা যায় না। পেট-কাঁকালের দায়ে এবং অন্য বহুবিধ দায়ে পড়িয়া ব্রাহ্মণগণ স্বতন্ত্র পথে চলিতে বাধ্য হইয়াছেন। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম উঠিয়া গিয়াছে। অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া আসিয়া সম্প্রতি লুপ্তপ্রায় হইয়াছে; যৎকিঞ্চিৎ প্রচলিত আছে তাহা নগণ্যের মধ্যে।

এদেশে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম পুনর্ব্বার প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু গৃহে বাস করিয়াও সদ্‌বৃত্ত পালন করা যাইতে পারে। সেই আশায় আমরা নানা শাস্ত্র হইতে সদ্‌বৃত্ত সঙ্কলন করিয়া আয়ুর্ব্বেদের পাঠকদিগকে ক্রমশঃ উপহার প্রদান করিব স্থির করিয়াছি।

কবিরাজ শ্রীশীতল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন।

চরকোক্ত ষড়ুপায় বিধি।

—:*:—

কবল বিধি।

বায়ু, পিত্ত, কফনাশী দ্রব্য মুখে দিয়া।
কবলে অর্দ্ধাংশ ত্যাগে চর্ব্বণ করিয়া॥
কবলে আহার্য্য দ্রব্যে অভিরুচি হয়।
নাশে-কফ, তৃষ্ণা, শোষ, বৈরস্য নিচয়॥

প্রতিসারণ বিধি।

চূর্ণ বা কল্কাবলেহ, অঙ্গুলি দ্বারায়।
ঘর্ষিলে 'প্রতিসারণ' দন্তাস্য জিহ্বায়॥
তা'তে-মুখ-বিরসতা, দুর্গন্ধ তাহার।
মুখশোষ, তৃষ্ণারুচি, দন্তাঢ্য সংহার॥
অসম্যক কৃতে হয় মুখের জড়তা।
কফোৎক্লেশ, রসাস্বাদে শক্তির হ্রাসতা।
অতিরিক্তে-মুখপাক, মুখশোষ আর,
তৃষ্ণা, বমি, ক্লান্তি ভাব, হইবে তাহার॥

মূর্দ্ধতৈল বিধি।

অভ্যঙ্গ ও পরিষেক, পিচু, বস্তি আর।
যথাক্রমে বলবান মূর্দ্ধতৈল চার॥
অভ্যঙ্গাদি আদি ত্রয় প্রসিদ্ধ সকল।
শিরোবস্তি বিধি তেঁই কহিব কেবল॥
দ্বিমুখ দ্বাদশাঙ্গুলি, চর্ম্ম বিনির্ম্মিত,
শিরোবস্তি রোগী-শিরে করিয়া যোজিত;
সন্ধিস্থান পিষ্ট মাষকল্কায়ে রুধিবে।
বস্তি, রোগী-মস্তকের প্রমাণ হইবে॥
ঈষদুষ্ণ স্নেহে তাহা করিয়া পূরণ,
নাশা, কর্ণ, মুখস্রাব নহে যতক্ষণ,
কিম্বা শূল উপশম না হয় যাবৎ,
অথবা সহস্র মাত্রা কাল, এতাবৎ,
রাখিবে ধারণ করি; রাখি অনাহারে,
শিরোবস্তি-দান বৈদ্য করিবে তাহারে॥

পাঁচ কিম্বা সাতদিন মস্তকে ধারণ।
করিবে এ শিরোবস্তি কর্ত্তব্য-কারণ॥
মস্তক হইতে বস্তি করিয়া মোচন।
সেই স্নেহ সর্ব্ব অঙ্গে করিবে মর্দ্দন॥
ঈষদুষ্ণ জলে তা'কে স্নান করাইবে।
দুর্জ্জয় বাতজ রোগ এতে পলাইবে॥
শিরঃকম্প আদি রোগ নাশিবে নিশ্চয়।
সর্ব্বকালে শিরোবস্তি প্রয়োজিত হয়॥

কর্ণপূরণ বিধি।

কর্ণে স্বেদ দিয়ে, রোগী পার্শ্বশায়ী করি,
দিবে উষ্ণ মূত্র, স্নেহ, মাংস রস পূরি।
কর্ণ-কণ্ঠ-শিরোগত রোগে পাঁচশত,
গুরু উচ্চারণ কাল রাখিবে সেমত॥
মূত্রাদি কর্ণপূরণে আহারের আগে।
সূর্য্যাস্তের পরে, কর্ণে তৈলাদি প্রয়োগে॥
কর্ণ-শূলে-ঈষদুষ্ণ ছাগমূত্র সহ,
সৈন্ধব মিলিত করি দেয় যদি কেহ,
কর্ণশূল, কর্ণপাক প্রভৃতি যে রোগ।
নিশ্চয় বিনাশ হ'বে করিলে প্রয়োগ॥
আদা, যৈষ্টমধু, তৈল, সৈন্ধব—এসব।
ঈষদুষ্ণ কর্ণে দিলে বেদনা লাঘব॥
পীতাকন্দ পত্রে ঘৃত করিয়া ম্রক্ষণ।
তপ্ত নিষ্পীড়িত রস শূলঘ্ন তেমন॥

কর্ণপূরণ ঔষধ।

আমলকী, তিলপর্ণী পাতিলেবুর রস,
সোহাগার খৈ কিম্বা কাগজির রস,
ঈষদুষ্ণ, বারি কর্ণে করিলে প্রদান,
কর্ণের বেদনা তা'তে হবে অন্তর্দ্ধান॥
কদ্‌বেল টাবালেবু-আদা-রস কাঁজী।
উষ্ণবারি কর্ণশূলে দিতে হবে রাজী॥

কাঁজীতে আকন্দাঙ্কুর পেষণ করিয়া,
তৈল ও লবণ তা'তে ল'বে মিশাইয়া;
মনসা-ডালের মধ্য কুরিয়া তৎপরে,
আবরি মনসা পত্রে রাখি তদন্তরে;
পুট পাক করি তার ঈষদুষ্ণ রসে।
সুদারুণ কর্ণপীড়া পূরণে বিনাশে।
মহাপঞ্চ মূল-কাঠ অষ্টাঙ্গুলমান,
বেষ্টিয়া রেশমী বস্ত্রে তৈলেতে সন্ধান;
অগ্নি জ্বালাইয়া নিম্নে পাত্রটি রাখিবে,
তাহাতে বিচ্যুত তৈলে দীপিকা জ্বালিবে॥
ঈষদুষ্ণ কর্ণে ইহা করিলে প্রদান।
কর্ণের বেদনা সদ্যঃ হয় অন্তর্দ্ধান॥
এইরূপ দেবদারু, কুড়কাষ্ঠ দিয়া।
দীপিকা প্রস্তুত হয় রাখিবে জানিয়া॥
শোনামূল-কল্কসহ বিহিত বিধানে।
পাকতৈলে ত্রিদোষজ কর্ণশূল হানে।
যষ্টিমধু, অশ্বগন্ধা, ধনে, মাষকলায়ে,
ইহাদের কল্ক ক্বাথ; শূকর-বসয়ে,
পাক করি কর্ণে তাহা করিলে পূরণ।
কর্ণনাদ রোগ এতে হয় প্রশমন॥
সাচিক্ষার, শুষ্ক মূলা, শুল্‌ফা, পিপুল,
হিঙ্গুকল্ক, তৈলএর চতুর্গুণ তুল।
তৈল-চতুর্গুণ শুক্ত করিয়া মিলন।
পাক করি কর্ণে তাহা করিলে পূরণ।
কর্ণনাদ, কর্ণশূল, বাধির্য্য অপর।
কর্ণস্রাব প্রশমিত হইবে সত্বর॥
আপাঙ্গের ক্ষার জল, কল্ক ও তাহার,
সেই তৈলে কর্ণ রোগ হয় প্রতিকার।
শম্বুকের মাংস, কটু তৈলে পাক করি,
কর্ণে দিলে শীঘ্র যায় কর্ণ-নালী সারি,
পঞ্চকষায়ের চূর্ণ কয়েতবেল রস,
মধুযোগে কর্ণে দিলে কর্ণস্রাব রস।

গাব, হরীতকী, লোধ, আমলকী আর,
মঞ্জিষ্ঠা পঞ্চকষায় নামটী ইহার।
সর্জ্জিক্ষার চূর্ণ দিলে টাবালেবু যোগে,
কর্ণস্রাব-দাহ-শূল রোগে নাহি ভোগে।
আম-জাম-মৌল-বট-পত্র কল্ক সহ,
যথাবিধি তৈল পাক করি যদি কেহ,
পূতিকর্ণ রোগে তাহা করিয়ে প্রদান।
অচিরে সে রোগ তবে হয় অন্তর্দ্ধান॥
গোমূত্র ও হরিতাল করিয়া মিলন,
কিম্বা কটুতৈলে কর্ণ কীট-প্রশমন।
সজিনা ও হুড় হুড়ে, আলকুশী রসে,
ত্রিকটুর চূর্ণে তথা কর্ণ কীট নাশে।
মস্থ আর হিঙ্গু কর্ণে করিলে প্রদান।
আশু কর্ণ কীট তাতে হবে অন্তর্দ্ধান॥

লেপ বিধি।

লেপন, লিপ্তক, লেপ, একর্থজ্ঞাপন।
দোষঘ্ন, বিষঘ্ন, বর্ণ্য, ত্রিবিধ লেপন॥
চতুর্থাংশ, তৃতীয়াংশ, অর্দ্ধাঙ্গুলীমান।
পুরু লেপ আলেপনে ত্রিবিধ প্রমান॥
আদ্র লেপ ব্যবহার্য্য, ব্যাধি বিনাশক।
বিশুষ্ক প্রলেপ-দেহ-কান্তিসংহারক॥

দোষঘ্ন লেপ।

পুনর্ণবা, দেবদারু, সরিষা ধবল,
শুণ্ঠি, সজিনার ছাল মিলিত সকল;
কাঁজিতে পেষণ করি, করিলে লেপন।
সর্ব্ববিধ শোথ এতে হইবে নিধন॥
শিরিষ, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, এলা,
তগর পাদুকা, জটামাংসী, কুড়, বালা;
হরিদ্রা যুগল,—সব চূর্ণ করি নিবে।
পঞ্চমাংস তাতে মিলিত করিবে॥
জল সহযোগে ইহা করিলে লেপন।
বিসর্প, বিস্ফোট, ব্রণ, শোথ বিনাশন॥

বিষঘ্ন লেপ।

ছাগদুগ্ধ, তিলসহ করিয়া মিলিত;
অথবা কৃষ্ণমৃত্তিকা, তিল নবনীত,
পেষণ করিয়া দুই করিলে লেপন।
ভল্লাতকজাত শোথ হইবে নিধন॥

বর্ণ লেপ।

লোহিত চন্দন, লোধ, মঞ্জিষ্ঠা ও কুড়,
প্রিয়ঙ্গু বটের ঝুড়ি, সহিত মসুর;
একত্র পেষণ করি, করিলে লেপন।
ব্যঙ্গনাশী মুখকান্তি করিবে বর্দ্ধন॥

লেপের বিধান।

প্রলেপ প্রভেদ ভেদে দ্বিবিধ কথিত,
লেপের বিধান ক্রমে হইবে বর্ণিত॥
মহিষ চর্ম্মের ন্যায় উন্নত উভয়।
আদ্র ব্যবহৃত লেপ জানিবে নিশ্চয়॥
শীতল, পাতলা, শোষী, পিত্তবিনাশক।
তাহাকে প্রলেপ বলি কহিবে ভিষক॥
আদ্র, গাঢ়, শুষ্ক লেপ প্রদেহ সংজ্ঞক।
প্রদেহ বাত ও কফ প্রশান্তি কারক॥
নিশিতে ও শুষ্ক লেপ ব্যবহৃত নয়।
ব্রণাদি পীড়ন হেতু শুষ্কতেও হয়॥
তমোতে আবৃত উষ্মা রোমকূপস্থিত।
রাত্রিকালে স্বভাবতঃ হয় বিনিস্থত॥
প্রলেপ থাকিলে উষ্মা বাহিরিতে নারে।
রাত্রিতে প্রলেপ তেঁই কভু না আচরে॥
অপাকী, প্রবল রক্ত শ্লেষ্মা সমুদ্ভব।
ব্রণে লেপ রাত্রি যোগে অবশ্য সম্ভব॥
যষ্টিমধু, সূচিমুখী, লোহিত চন্দন,
বালা, পদ্ম, চিতামূল, পর্পট, বিরন্,
সমভাগে জলদ্বারা পেষণ করিয়া।
লেপ দিলে পিত্ত-শোথ যাইবে সারিয়া

প্রদেহ।

ছোলঙ্গ লেবুর মূল, জটামাংসী আর,
দেবদারু, রাম্না, শুণ্ঠী, গণিয়ারীচার,
তুল্য পিষ্ট; উষ্ণ করি করিলে প্রদেহ।
বাত শোথ নিবারিত হয় নিঃসন্দেহ॥

কবিরাজ শ্রীরাসবিহারী রায়
কবিকঙ্কণ।

বর্ষাচর্য্যা।

—:*:—

এই সময়ে আকাশ সর্ব্বদা মেঘে আচ্ছন্ন থাকে এবং সর্ব্বদা প্রচুর বারি বর্ষণে ভূমি আর্দ্র হয়। ফলে বর্ষাকালে প্রাণীগণের শরীরও আর্দ্রতা-প্রবণ হইয়া থাকে। মানব-শরীরে গ্রীষ্মকালের সঞ্চিত বায়ু প্রকুপিত হওয়ায় যাহাতে বায়ু প্রশমিত হয়, বর্ষা-ঋতুতে তাহার চেষ্টা করা উচিত। এই সময়ে আহারের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। আহারের ব্যতিক্রমে অগ্নিমান্দ্যের সৃষ্টি ত সকল ঋতুতেই হইয়া থাকে, এই সময় আহা-রের ব্যতিক্রমে তাহার সম্ভাবনা আরও অধিক। গুরুভোজন করিলে এ সময় সহজে পরিপাক হয় না, এজন্য লঘুদ্রব্য আহার করা কর্ত্তব্য। এই ঋতুতে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টির জন্য কখন শীতকালের মত বোধ, কখন অনা-বৃষ্টি জন্য সূর্য্যের তেজে গ্রীষ্মকালের ন্যায় বোধ হইয়া থাকে। এই জন্য এই সময়ে অন্যান্য ঋতুর ন্যায় শয়ন, আহার, শয্যা, পরিচ্ছদ প্রভৃতি সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া পরিবর্ত্তন করিবে। বৃষ্টির সময়ে জলে ভিজিবেনা। গাত্র সর্ব্বদা ঢাকিয়া রাখিবে। কারণ এই সময়ে ভূমি হইতে একরূপ দূষিত বাষ্প উত্থিত হইয়া থাকে। উহা অত্যন্ত অনিষ্ট জনক। সমস্ত পানীয় দ্রব্যের সহিত কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে এ সময় সুফলদায়ক হইয়া থাকে। বৃষ্টির জল, কূপ, সরোবর, নদী ও পুষ্করিণীর জল উষ্ণ করিয়া, শীতল হইলে, সেই জলে স্নান করা এ সময় স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী হইয়া থাকে। পানীয় জল সম্বন্ধেও এইরূপ রীতি অবলম্বন করা মন্দ নহে। এই ঋতুতে জাঙ্গল মাংস, পুরাতন চাউলের অন্ন, অম্ল, লবণ ও স্নিগ্ধ দ্রব্য আহার করিবে।

এই সময় নির্ম্মল কার্পাস বস্ত্র পরিধান করা হিতজনক। এই ঋতুতে নদীর জল পান করিতে নাই এবং ভূমিতে শয়ন বিশেষ অহিতকর।

ব্যায়াম সকল ঋতুতেই হিতকর, এ সময়ও সহ্য মত ব্যায়াম করা কর্ত্তব্য। এই ঋতুর উৎপন্ন ওষধি সকল অল্পবীর্য্য হইয়া থাকে। এই সময়ে চন্দ্র কিরণ দ্বারা পৃথিবী সৌম্যমূর্ত্তি ধারণ করে। তাহার জন্য অম্ল, লবণ ও মধুর রস বৰ্দ্ধিত হয়। বর্ষা বিসর্গ ঋতু বলিয়া প্রাণীগণের বল ও বর্ণ এই সময়ে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

শাস্ত্রকার বলিয়াছেন, একালে মধুর রস সেবন করিলে রস, রক্ত, মাংস, মেদ, মজ্জা, অস্থি ও শুক্র বৰ্দ্ধিত হয়, এবং তদ্দ্বারা দৃষ্টি শক্তির প্রখরতা জন্মে এবং বল ও বর্ণের উৎকর্ষ সাধিত হয়। এ সময় অম্ল রস সেবনে

বায়ুর অনুলোম সাধিত হয়, কারণ অম্লরস জারক ও পাচক।

লবণ রস দ্বারা পাচক ও সংশোধক শক্তি বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু অতিমাত্রায় কোন দ্রব্য সেবনই কর্ত্তব্য নহে।

সকল দ্রব্যের অপরিমিত সেবনেই অনিষ্ট হইয়া থাকে। অমৃতের ন্যায় উপকারী এমন যে দুগ্ধ, যাহা আমাদের ভূমিষ্ঠ কাল হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত জীবনী-শক্তির পরিবর্দ্ধক বলিয়া শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট, তাহাও যদি অত্যাধিক পরিমাণে পান করা যায়, তাহা হইলেও তদ্দ্বারা অজীর্ণাদি রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ফল কথা হিতকর বস্তুরও অধিক মাত্রায় সেবা করিলে রোগের কারণ হইয়া থাকে। শাস্ত্রকার বলেন—

"প্রাণাং প্রাণভৃতামন্নং তদ্যুক্ত্যা হিতস্ত্যসূন্।
বিষং প্রাণহরং তচ্চ যুক্তিযুক্তং রসায়নম্"।

শ্রীসুধাংশু ভূষণ সেন গুপ্ত।

প্রাপ্ত গ্রন্থাদির সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

টাইফয়েড চিকিৎসা।—ডাক্তার শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র দাস প্রণীত ও "কাজের লোক" সম্পাদক শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রকাশিত। মূল্য এক টাকামাত্র। সান্নিপাতিক বা টাইফয়েড্ জ্বর কি এবং তাহার লক্ষণাবলী দেখিয়া হোমিওপ্যাথিক্ মতে কিরূপ চিকিৎসা করা উচিত—ইহা লইয়া পুস্তক খানি লিখিত হইয়াছে। এই রোগে নাড়ীর গতি কিরূপ হয়, কিরূপ নাড়ীর অবস্থা হইলে এ রোগে মৃত্যু হইতে পারে, এ সকল কথার আলোচনা করিবার জন্যও গ্রন্থকার যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার শ্রম সার্থক হইয়াছে। তিনি নাড়ীর কথা বলিতে গিয়া একস্থলে বলিয়াছেন, "নাড়ী যদি ক্ষুদ্র ও অত্যন্ত দ্রুত হয়, তাহা হইলে ভয়ানক দৌর্ব্বল্যের পরিচায়ক, টাইফয়েড্ বা সান্নিপাতিক জ্বরের শেষ অবস্থায় এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।" আমাদের আয়ুর্ব্বেদ বলিয়াছেন,—"ক্ষীণে বলবতী নাড়ী, সা নাড়ী প্রাণ ঘাতিকা"। কাজেই গ্রন্থকার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক হইলেও আয়ুর্ব্বেদের উপর তাঁহার শ্রদ্ধা আছে বুঝা গেল। কিরূপ ভাবে রোগের বীজাণু শরীর মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারে, এই রোগের আক্রমণে কিরূপ নিয়ম পালন করা উচিত,—এ সকল কথারও বেশ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এইজন্য পুস্তকখানি শুধু চিকিৎসক দিগের পাঠ্য নহে, সাধারণ লোকের পক্ষেও বিলক্ষণ উপকারী হইয়াছে বলা যাইতে পারে। গ্রন্থকার যে উদ্দেশ্য লইয়া পুস্তক রচনা করিয়াছেন, তাহা সিদ্ধ হইয়াছে। এইরূপ পুস্তকের প্রচারে দেশের উপকার হইবে।

আয়ুর্ব্বেদ তত্ত্ব-বিজ্ঞান।—পূর্ব্বখণ্ড।—কবিরাজ শ্রীরাসবিহারী রায় কবিকঙ্কণ কর্ত্তৃক ও প্রণীত প্রকাশিত। এই পূর্ব্বখণ্ড দুইটি ভাগে বিভক্ত। ১ম ভাগে সৃষ্টিতত্ব এবং ২য় ভাগে স্বাস্থ্যতত্ব লিখিত হইয়াছে। চরক, সুশ্রুত, ভাব প্রকাশ

ও মাধবনিদান প্রভৃতির সরল পদ্যানুবাদ করিয়া গ্রন্থখানি রচিত। রচনা অতি সুন্দর হইয়াছে। নীরস ও জটিল আয়ুর্ব্বেদীয় শ্লোকের ভাব-সমষ্টি ঠিক বজায় রাখিয়া, সরল পদ্যে এরূপ ধরণের গ্রন্থ প্রণয়ণ করা বড়ই কঠিন। প্রকৃত কবি এবং ভাবুক ভিন্ন সে সকল শ্লোকের অনুবাদ এরূপ সহজ ভাবে ব্যক্ত করা সম্ভবপর নহে। সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞগণ যদি যত্নপূর্ব্বক এই গ্রন্থ খানি পাঠ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা সৃষ্টিতত্ত্ব, এবং খাদ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক কথা শিক্ষা করিয়া, আপনাপন স্বাস্থ্যোন্নতি লাভে সমর্থ হইবেন। দেশের অঙ্গনাগণ বাজে নাটক-নবেলের পাঠ-স্পৃহা কয়েক দিনের জন্য বন্ধ রাখিয়া যদি এ গ্রন্থ খানি পাঠ করেন, তাহা হইলেও নিজ নিজ সংসারের মঙ্গল সাধন করিতে পারিবেন। মূল্য কত—তাহার উল্লেখ কিন্তু গ্রন্থের কোন স্থানেও পাওয়া গেল না।

আয়ুর্ব্বেদতত্ত্ব বিজ্ঞান।—মধ্যখণ্ড।—কবিরাজ শ্রীরাসবিহারী রায় কবি কঙ্কণ প্রণীত। এখানি মাধবকর কৃত নিদানের পদ্যানুবাদ। অনুবাদ বেশ সহজ ও প্রাঞ্জল হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থগুলিকে এরূপ ভাবে সাধারণের বোধগম্য করিতে চেষ্টা করিলে, দেশবাসীর প্রভূত উপকারের সম্ভাবনা। আমরা এরূপ গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

যোগবল।—ধর্ম্মতত্ত্ব এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বিষয়ক আয়ুর্ব্বেদীয় মাসিক পত্র। সম্পাদক কবিরাজ শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত কবিভূষণ। প্রকাশক শ্রীদেবেন্দ্রনাথ গুপ্ত কবিরাজ, ৩নং কাশীনাথ দত্তের ষ্ট্রীট কলিকাতা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুলসহ ১৷৵৹ আনা। ২য় বর্ষ। তিন খণ্ডে দুই দুইসংখ্যা করিয়া ১ম হইতে ৬ষ্ঠসংখ্যা। সবগুলির প্রত্যেক খণ্ডেই দুই সংখ্যা করিয়া বাহির হইয়াছে, এজন্য এখানিকে ইহার পরিচালকগণ "মাসিক পত্র অভিধান প্রদান করিলেও, ইহা ঠিক মাসিক কি না বুঝা গেল না, দুইমাস অন্তর ইহা বাহির হয় বলিয়াই উপলব্ধি হইল। তাহার পর "ধর্ম্মতত্ত্ব এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বিষয়ক আয়ুর্ব্বেদীয় মাসিক পত্র" নাম কেন যে ইহার পরিচালকগণ প্রদান করিয়াছেন, তাহাও বুঝিলামনা, শুধু "আয়ুর্ব্বেদীয় মাসিক পত্র" বলিলে, "আয়ুর্ব্বেদ" কথাটির মধ্যে কি ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝাইতনা? তবে "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বিষয়ক আয়ুর্ব্বেদীয় মাসিক পত্র"—এ কথাটি বলায় অবশ্যই বাহাদুরী আছে। এতদিন "আয়ুর্ব্বেদ" বলিলে উহা প্রাচ্য বলিয়াই সকলে জানিত, এখন কিন্তু "যোগবল" প্রচারে লোকে বুঝিবে, আয়ুর্ব্বেদ শুধু প্রাচ্য নহে,—ইহা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়ে উদ্ভূত হইয়াছে। অবশ্য স্বীকার করি, বর্ত্তমান সময়ে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার স্রোত অনেকটা বদলাইয়া গিয়াছে। সেকালের মত রোগ আরোগ্য করিবার জন্য সকলেই ধন্বন্তরিকল্প চিকিৎসক হইতে ইচ্ছা করেননা, এখনকার দিনে পাশ্চাত্য চিকিৎসা-ব্যবসায়ের পেটেণ্ট ঔষধাদির অনুকরণে মফস্বলে ক্যাটালগ-প্রচারেই অনেকের চিকিৎসা-বৃত্তি সিদ্ধ করা হয়। বাহ্যতঃ অনেক গোঁড়া কবিরাজ ম্যালেরিয়া জ্বর তাড়াইবার জন্য নানারূপ চেষ্টা করিয়াও যখন অকৃতকার্য্য হয়েন, তখন অতিসন্তর্পনে রসসিন্দুরাদির সহিত গোপনে কুইনাইন মিশাইয়া "ম্যালেরিয়ার সিদ্ধ বটিকা" প্রয়োগে

রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন। যোগবলের সম্পাদক কি এই অর্থে "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বিষয়ক আয়ুর্ব্বেদীয়" কথার ব্যবহার করিয়াছেন? ফল কথা, আমরা এ কথাটীর অর্থ বুঝিলাম না। কাগজের বাহিরে ত এই, এইবার ভিতরের প্রবন্ধ প্রকাশের কথা। ১ম ও ২য় সংখ্যা নাম যুক্ত ১ম বহিখানিতে প্রথমেই প্রকৃতি ও বিকৃতির কথা। এই প্রবন্ধে ধান ভানিতে শিবের গীত অনেক গাহা হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা এই প্রবন্ধের লেখক বর্দ্ধমানবাসিনী রমণী সমাজের "বাজখাই আওয়াজ" শ্রবণে প্রথমতঃ "কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশায় প্লীহা বিদীর্ণ হইবার উপক্রম" ভয়ে যে ভীত হইয়াছেন, তাহাই আমাদের দুঃখের কারণ। বলি, নাম জাহির করিবার জন্য, কাগজ পুরাইবার জন্য প্রবন্ধ লিখিতেছ, লেখ, তাহাতে কাহারও আসিয়া-যাইতেছে না, কিন্তু তাহাতে রমণী সমাজে বিদ্রূপ-বর্ষণ কি শিষ্টাচারের পরিচায়ক? বাসন-বিক্রেত্রী হইলেও রমণী, রমণী। যদি হিন্দু বলিয়া পরিচয় প্রদান কর, তাহা হইলে তাঁহাদের সম্মান বজায় রাখিয়া তোমাকে চলিতেই হইবে। তাহার ব্যতিক্রমে সৌজন্যহানি অবশ্যম্ভাবী, ইহা প্রত্যেক হিন্দুই স্বীকার করিবেন। ঐ পুস্তকে ইহার পর "নাড়ীজ্ঞান রহস্য"। ইহাতেও রহস্যজনক ব্যাপার-সমাবেশের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। লেখক একস্থলে বলিয়াছেন,—"অনেকের ধারণা যে, নাড়ীজ্ঞানটা কিছুই নহে, উহা লোক ভুলান একটা ছলনা বা চাতুরী মাত্র।" কিন্তু এই "অনেকের ধারণা" শব্দে কাহাদিগকে "অনেক" অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা কিন্তু লেখক খুলিয়া বলেন নাই। শুধু "ক্ষোভ" প্রকাশই করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার সেই ক্ষোভ-প্রকাশ ব্যর্থ হইয়াছে। আমরা খুব জোর-করিয়া বলিতে পারি, "নাড়ী জ্ঞানটা কিছুই নহে, উহা লোক ভুলান ছল বা চাতুরী" এরূপ কথা বাঙ্গালা দেশের কোন স্থলে কোন সম্প্রদায়ের লোকেরই মুখে এপর্য্যন্ত শুনিতে পাওয়া যায় নাই, সুতরাং ইহা এই প্রবন্ধ লেখকের প্রবন্ধ-রচনার চাতুর্য্য ভিন্ন কিছুই নহে। তাহার পর মাসিক পত্র নাম দিয়া কাগজ বাহির করিতে হইলে, এইরূপ একটি বা দুইটি প্রবন্ধ লইয়া সংখ্যা-সমাপ্তিও কর্ত্তব্য নহে। তবে আয়ুর্ব্বেদীয় মাসিক পত্রের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, ততই দেশের মঙ্গলের কথা। সেই হিসাবে ইহার পরিচালকগণ আমাদের ধন্যবাদের পাত্র।

কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত
কবিরঞ্জন।

দুইখানি পত্র।

১ম পত্র।

"ভারতবর্ষের" অশিষ্টাচার।

গত জ্যৈষ্ঠ মাসের "ভারতবর্ষে" কবিরাজ সম্প্রদায়কে বিদ্রূপ করিয়া একটি অদ্ভুত চিত্র প্রকাশ করা হইয়াছে দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইয়াছি। রোগী ও কবিরাজ অবলম্বনে

ঐ চিত্র ফলিত। রোগী, কবিরাজের নিকট বলিতেছেন,—"মহাশয় প্রস্রাব সরল হই-তেছেনা"—অমনি কবিরাজ বলিতেছেন,—"হাতখানি দেখি"—ইহাই চিত্র-কথায় প্রকাশ। প্রস্রাব সরল হইতেছে না বলায়, 'হাত দেখা'টা "ভারতবর্ষে"র চিত্রকর্ত্তার নিকট আশ্চর্য্য বোধ হইলেও ইহা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার বহির্ভূত বিষয় নহে। বায়ু, পিত্ত ও কফ লইয়াই আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার কৃতিত্ব। যে কোন রোগেরই চিকিৎসা করা হউক, ঐ বায়ু, পিত্ত ও কফ—এই তিনটিকে অবলম্বন করিয়া চিকিৎসা করিতে হইবে—ইহাও আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার বিশেষত্ব। প্রস্রাব সরল না হইলে, আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা-শাস্ত্রে তাহাকে মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত বা প্রমেহের অঙ্গীভূত রোগ নামে অভিহিত করা হয়। সেই সকল রোগাক্রান্ত ব্যক্তির ধাতু বায়ু প্রধান, কি পিত্ত-প্রধান, কি কফ-প্রধান, কি কোন্ দুইটীর সমন্বয়ে দ্বন্দ্বজভাবে উৎপন্ন হইয়াছে, সর্ব্বাগ্রে ইহা জ্ঞাত হইয়া তবে চিকিৎসাকার্য্যে হস্তক্ষেপ করা উচিত। "ভারতবর্ষে"র চিত্রকর্ত্তা 'এম-বি' উপাধি-যুক্ত ডাক্তার, তিনি এ রহস্য কেমন করিয়া অবগত হইবেন? তিনি ত পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিদ্যায় সুপণ্ডিত; "আয়ুর্ব্বেদ" লইয়া ত ঘাঁটাঘাঁটি করেন নাই, সুতরাং আমরা "ভারতবর্ষে" প্রকাশিত এই অদ্ভুত ধরণের চিত্র দেখিয়া চিত্রকর্ত্তা ডাক্তার বাবুর চিত্র-কৌশলে আদৌ বিস্মিত হই নাই, "তবে "ভারতবর্ষে"র মত উচ্চ শ্রেণীর মাসিক পত্রের সম্পাদক মহাশয় যে এরূপ চিত্র পত্রস্থ করিয়া পত্রের গৌরব-মর্য্যাদা নষ্ট করিতে পারেন, ইহার জন্যই দুঃখিত হইয়াছি।

২য় পত্র।*

ঢাকায় বৈদ্য-সম্মেলন।

বৈদ্য বা আয়ুর্ব্বেদ-সম্মেলনের অধিবেশন হইবার কথা শুনিলেই—আমাদের প্রাণে আশা জাগিয়া উঠে। আমাদের মনে হয়, স্থানে স্থানে এরূপ অধিবেশনের ব্যবস্থা হইলে, ইহা হইতে লুপ্তপ্রায় আয়ুর্ব্বেদের মহিমা-কীর্ত্তনে ভারতাকাশে বৈদ্য-চিকিৎসার গরিমা বুঝি আবার ফুটিয়া উঠিবে,—সে গরিমা-স্ফুরণে দেশের লোকে আবার আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার প্রতি যথোচিত সমাদরে অভ্যস্ত হইবে। ইহা ভিন্ন সকল সম্মেলনেই যে একতা বৃদ্ধির উপায় হইয়া থাকে, আমাদের বৈদ্য বা আয়ুর্ব্বেদ সম্মেলনেও বুঝি আমাদের মধ্যে সে একতা-বৃদ্ধি বিশেষরূপে হইতেছে দেখিতে পাইব। পূর্ব্ববঙ্গের শ্রেষ্ঠ সহর—শুধু পূর্ব্ববঙ্গের শ্রেষ্ঠ সহর কেন,—একদা বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রধান রাজধানী—ঢাকানগরীতে বৈদ্যসম্মেলনের ব্যবস্থা হইতেছে দেখিয়া এই জন্যই আমরা অত্যন্ত আশান্বিত হইয়াছিলাম। আমরা ভাবিয়াছিলাম, এই অধিবেশনে বাঙ্গালার বাঙ্গালী চিকিৎসকগণের সকলেই বুঝি ইহাতে সম্মিলিত হইবেন, সে সম্মিলনে আয়ুর্ব্বেদের উন্নতিকল্পে নানা প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইবে,—বাঙ্গালা দেশের কবিরাজগণের মধ্যেও বুঝি এই উপলক্ষে একতা-বৃদ্ধির ব্যবস্থার একটা উপায়-বিধান করা হইবে। কিন্তু সে সব কিছুই হইল না দেখিয়া ঢাকার বৈদ্যসম্মেলনের অধিবেশনের ফলে আমাদিগকে নিরাশই হইতে হইয়াছে। কলিকাতা হইতে সভাপতি

* এই পত্রখানি বহুপূর্ব্বে হস্তগত হইয়াছে, স্থানাভাবে প্রকাশিত হয় নাই। (আঃ সং)

মহাশয় ভিন্ন আর কোন কবিরাজই ঐ অধিবেশন উপলক্ষে গমন করেন নাই,—ইহা নিশ্চয়ই সম্মেলনের সার্থকতার অন্তরায় বলিতে হইবে। কেহ কেহ বলিতেছেন,—সখের থিয়েটারে যাঁহারা main part লইয়া থাকেন, তাঁহাদের অভিনয়ের কৃতিত্ব দেখাইবার জন্যই তাঁহারা অভিনয়ের পুস্তক নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন। এক্ষেত্রেও নাকি সেই ব্যবস্থা হইয়াছিল এবং সেইজন্যই নাকি দেশের নামজাদা কবিরাজদের কেহ সে সম্মেলনে যোগদান করেন নাই। তাহার পর সম্মেলনে অনেকরূপ কেলেঙ্কারীও হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। অনেকে বলিতেছেন,—সমাগত ব্যক্তিদিগকে যথোপযুক্ত আদর ও যত্ন করা হয় নাই। ময়মনসিংহের "চারুমিহির" এবং কলিকাতার "হিতবাদী" পত্রে সে সকল কেলেঙ্কারীর অনেক কথাই প্রকাশ পাইয়াছে। সভাপতির অভিভাষণেও আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকদিগের নামোল্লেখের সময় প্রায় অধিকাংশ প্রথিতনামা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকের নাম বাদ পড়িয়াছিল, এ সকল লইয়াও নানা জনে নানারূপ জল্পনা-কল্পনা পূর্ব্বক ঢাকা সম্মেলনের দোষ বাহির করিতেছে। ফলকথা সম্মেলনের কর্ত্তৃপক্ষগণের ব্যবস্থার ত্রুটীতে যে সকল দোষ হইয়াছে, সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণে উল্লেখযোগ্য কবিরাজ মহাশয়দিগের নাম বাদ পড়িয়াছে দেখিয়া আমরা তদপেক্ষা অধিকতর দুঃখিত হইয়াছি। এই জন্যই বলিতে হয়, ঢাকার এই বৈদ্যসম্মেলনের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছে। অনেকে বলিতেছেন,—এ সম্মেলনের আয়োজন এরূপ ভাবে করা ভাল হয় নাই।

শ্রী—

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ে প্রবেশার্থি ছাত্রদিগের প্রতি বিজ্ঞপ্তি।

—:*:—

বর্ত্তমান আষাঢ় মাসের শেষভাগ হইতে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও বাঙ্গালা বিভাগের ছাত্রদিগের নূতন সেসন বা নব বর্ষের অধ্যয়ন আরম্ভ হইবে। সংস্কৃত ভাষায় যাঁহাদিগের জ্ঞান জন্মিয়াছে, তাঁহারাই সংস্কৃত বিভাগে অধ্যয়নের অধিকারী হইবেন। বাঙ্গালা-বিভাগে, বাঙ্গালা ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি থাকা আবশ্যক এবং কিছু ইংরাজী শিক্ষা সমাপ্তির পর প্রবেশ করিতে হইবে। মধ্য ইংরাজী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বা ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাস পর্য্যন্ত পড়িয়াছেন,—বাঙ্গালা বিভাগের জন্য এরূপ ছাত্রদিগের আবেদনই গ্রহণ করা হইবে। এখন হইতে আবেদন করুন, নতুবা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ হইয়া গেলে আর কাহারও আবেদন গৃহীত হইবে না।

আবেদনে জাতি ও বয়সের কথা উল্লেখ করিবেন। অন্যান্য বিষয় জানিবার জন্য অর্দ্ধ আনার টিকিট সহ নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করিতে হইবে।

কবিরাজ শ্রীযামিনী ভূষণ রায়
কবিরত্ন এম্, এ, এম্, বি
অধ্যক্ষ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়।

আষাঢ় মাসের সূচী।

	বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
১।	কাজের কথা ...	কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত ...	৪২৫
২।	অনুকরণে আমাদের অবস্থা ...	" " "	৪২৮
৩।	শিশুর ক্রিমি চিকিৎসা ...	... ...	৪৩৭
৪।	আয়ুর্ব্বেদের কথা (কবিতা)	কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত ...	৪৪৫
৫।	অঙ্গরাগ ও অঙ্গরক্ষা ...	ডাক্তার শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাস ...	৪৪৬
৬।	হার্ট ডিজিজ্ ও হৃদ্‌রোগ ...	শ্রীরাজকুমার দাশগুপ্ত ...	৪৪৯
৭।	পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ ও টোট্‌কা ঔষধ	কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত ...	৪৫৩
৮।	আয়ুর্ব্বেদে নিদ্রাতত্ত্ব ...	কবিরাজ মণীন্দ্রনারায়ণ সেন ...	৪৫৫
৯।	সদ্বৃত্ত	কবিরাজ শ্রীশীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন	৪৫৮
১০।	চরকোক্ত ষড়ুপায়বিধি (কবিতা)	কবিরাজ শ্রীরাসবিহারী রায় কবিকঙ্কণ	৪৬৮
১১।	বর্ষা-চর্য্যা	শ্রীসুধাংশুভূষণ সেনগুপ্ত ...	৪৬৭
১২।	প্রাপ্তগ্রন্থাদির সংক্ষিপ্ত সমালোচনা	কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত ...	৪৬৮
১৩।	দুইখানি পত্র ...	... ...	৪৭১
১৪।	ছাত্রদিগের জন্য বিজ্ঞাপ্তি ...	... ...	৪৭২

"আয়ুর্ব্বেদের" নিয়মাবলী।

১। আয়ুর্ব্বেদের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা, ডাক মাশুল ।৵০ আনা ; আশ্বিন হইতে বর্ষারম্ভ। যিনি যে কোন সময়েই গ্রাহক হউন, সকলকেই আশ্বিন হইতে কাগজ লইতে হইবে।

২। মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে "আয়ুর্ব্বেদ" প্রকাশিত হয়। যে মাসের কাগজ সেই মাসের মধ্যে না পাইলে সংবাদ দিতে হয়। অন্যথা ঐ সংখ্যা পৃথক্ মূল্য দিয়া লইতে হইবে।

৩। প্রবন্ধ লেখকগণ কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন। যে সকল প্রবন্ধ মুদ্রণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত না হয়, সাধারণতঃ সেগুলি নষ্ট করা হইয়া থাকে, তবে লেখক যদি প্রত্যর্পণ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন এবং পুনঃ প্রেরণের টিকিট পাঠান, তাহা হইলে অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠান হইয়া থাকে।

৪। গ্রাহকগণ ঠিকানা পরিবর্ত্তনের সংবাদ যথাসময়ে জানাইবেন, নতুবা অপ্রাপ্ত সংখ্যার জন্য আমরা দায়ী হইব না। "আয়ুর্ব্বেদ" সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন নচেৎ কাজের বড়ই অসুবিধা হয়।

৫। রীপ্লাই কার্ড কিম্বা টিকিট না দিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না।

৬। বিজ্ঞাপনের হার—মাসিক এক পৃষ্ঠা বা দুই কলম ৮৲, মাসিক অর্ধ পৃষ্ঠা বা এক কলম ৪॥০, মাসিক সিকি পৃষ্ঠা বা আধ কলম ২॥০, মাসিক অষ্টাংশ পৃষ্ঠা বা সিকি কলম ১॥০। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দিতে হয়, এক বৎসরের মূল্য অগ্রিম দিলে টাকায় এক আনা কম লওয়া হয়। টাকা কড়ি এবং প্রবন্ধাদি শ্রীযামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন এম্-এ, এম্-বি, ৪৬ নং বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা এই ঠিকানায় এবং অন্যান্য পত্র নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কবিরাজ শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন
"আয়ুর্ব্বেদ" কার্য্যাধ্যক্ষ
২৯নং ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

২৯, ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় হইতে শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন দ্বারা প্রকাশিত ও ১৬১ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, গোবর্দ্ধন মেশিন প্রেস হইতে শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন দ্বারা মুদ্রিত।

শ্রাবণ, ১৩২৪ "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম-সাধনম্" Reg. C. 865.

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিক পত্র ও সমালোচক

সম্পাদক—

কবিরাজ শ্রীবিরজাচরণ গুপ্ত কবিভূষণ

,, শ্রীযামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন এম-এ, এম-বি,

সহঃ সম্পাদক কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা, মাশুল ।৵০
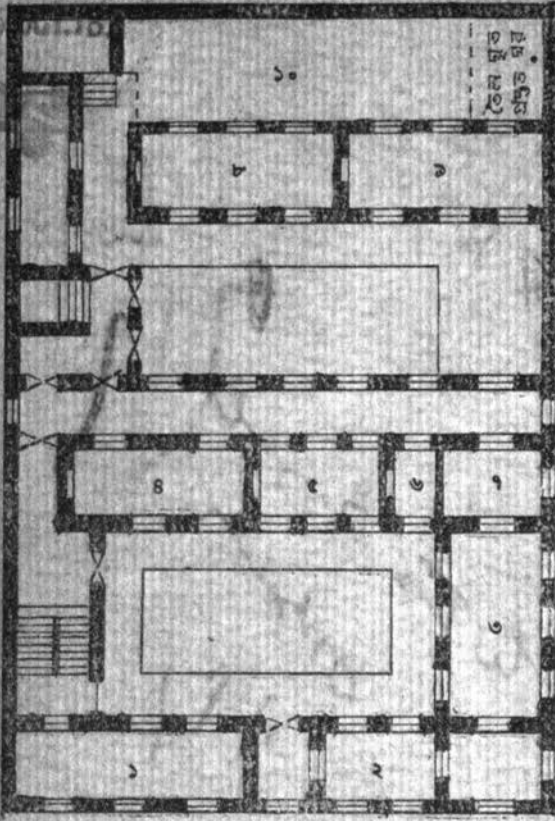
প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০

"অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়"

২৯, ফড়িয়া পুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এক তলা

১। কায়চিকিৎসা বিভাগ।

২। শল্যচিকিৎসা বিভাগ।

৩। ঔষধালয়।

৪। বিকৃত শারীরদ্রব্য সম্ভার।

৫। ভেষজপরিচয়াগার।

৬। আফিস ঘর।

৭। ভেষজ ভাণ্ডার।

৮। শারীর পরিচয়াগার।

৯। রসশালা।

১০। বৃক্ষবাটিকা।

দো-তলা

১১—১৩। পাঠাগার।

১৪। গবেষণা মন্দির ও যন্ত্রশস্ত্রাগার।

১৫। অধ্যাপক সম্মেলন ও গ্রন্থাগার।

১৬। ঠাকুর ঘর।

আয়ুর্ব্বেদ
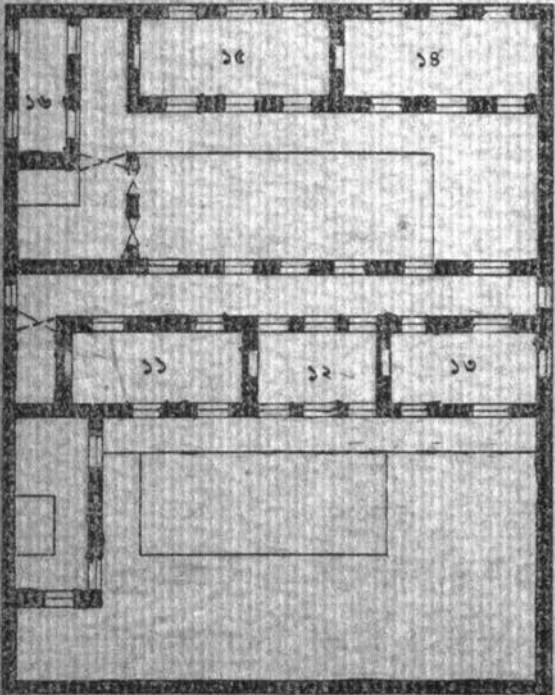
মাসিকপত্র ও সমালোচক।

১ম বর্ষ। বঙ্গাব্দ ১৩২৪—শ্রাবণ। ১২ম সংখ্যা। ১/

উদ্বোধন।

—:*:—

(১)

(ওগো) নিখিল বেদের শ্রেষ্ঠ যে টুকু,
—সে টুকু সকলি তুমি,
চতুর্ব্বর্গ লভি, তোমারি গর্ব্বে
ধন্য গো ভারত ভূমি।
প্রথম চিকিৎসা তোমাতে প্রকাশ,
প্রথম বিজ্ঞান তোমাতে বিকাশ,
প্রথম রাগিণী কণ্ঠে তোমারি
উঠিল দিগন্ত চুমি'।

(২)

প্রথমে তুমিই শিখা'লে বিশ্বে
জ্ঞানেরি গরিমা-গান,
প্রথমে তুমিই তুলিলে বিশ্বে
শ্লোকেরি অপূর্ব্ব তান।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ লইয়া,
বায়ু-পিত্ত-কফ মুখ্য করিয়া,
সে শ্লোক সমষ্টি করিলে রচনা
—স্বাথিতে জগত প্রাণ।

(৩)

প্রথমে তুমিই এসেছিলে যে গো
'শল্য-শালাক্য' বেশে,
প্রথমে তুমিই দিয়েছিলে ঢেলে
যা' কিছু সকলি দেশে।
তোমারি প্রথম সকল 'যন্ত্র'
তোমারি প্রথম 'অগদ তন্ত্র'
'কৌমার ভৃত্য' 'কায়' 'রসায়ন'—
শেখা'লে সকলি এসে।

(৪)

তোমার সেবার ব্রতটি লইয়া
মুখর হইল দিশি,
তোমার সেবক হইবে বলিয়া—
দেবতা আসিল মিশি।
অবতার বেশে এল দেবগণ'
করিল তোমার মহিমা কীর্ত্তন,
উদিল ভারতে সুখের তপন,
ঘুচিল তামসী—নিশি।

একদা তোমার উপদেশ-বাণী
মুগ্ধ করিল দেশ,
দীর্ঘ জীবন লভিল সকলে
ধরিয়া মোহন বেশ।
তোমারি নিয়মে জগত চলিল,
তোমারি নিয়মে সমাজ গঠিল,
(তুমি) বিশ্বে ঢালিলে শক্তি অপূর্ব্ব,
—ছিলনা যাহার শেষ।

(৬)

আরোগ্য-সম্পদ লভিল তাহাতে
দেশেরি যতেক লোক,
(তুমি) আশীষ করিলে অন্তর হইতে
"ধরণী সুখেতে রোক্।"
কি পাপে জানি না গেল সেই দিন,
তাহারি ফলেতে এবে আয়ুঃক্ষীণ,
আবার এস গো তুমি 'আয়ুর্ব্বেদ'—
'ভারত' তেমনি হোক্।

(৭)

আবার তোমার সেবাটি করিয়া
ঘুচুক রুগ্ন-জরা,
আবার তোমার আদেশ-পালনে
মত্ত হউক ধরা।
আবার তোমার শক্তি দেখিয়া,
আবার তোমারে ভক্তি করিয়া—
মত্ত হইয়া তোমারি ভাবেতে
রহুক বিশ্ব গড়া,
(ওগো) এস 'আয়ুর্ব্বেদ' অষ্টাঙ্গ লইয়া—
তেমনি সুখেতে ভরা।

আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি না অবনতি ?

আজ কাল অনেকেরই মুখে শুনিতে পাই যে, বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের সর্ব্ব প্রকারে উন্নতির দিন আসিয়াছে। প্রমাণ স্বরূপে অনেকেই দেখাইয়া থাকেন যে, কলিকাতা এবং মফঃস্বলে—সর্ব্বত্রই আয়ুর্ব্বেদ-ব্যবসায়ীর ও ঔষধালয়ের সংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি,—লোকের যদি আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার প্রতি শ্রদ্ধা না বাড়িত, তাহা হইলে, কলিকাতার প্রত্যেক গলিতে এত অধিক সংখ্যক আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধ বিক্রয়ের দোকান গুলি কখনই টিকিতে পারিত না। তাহার পর আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসায় যে সকল কবিরাজ মহাশয় আজকাল বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছেন, তাঁহাদের প্রণামীর গৌরব, মোটরকার ও জুড়ীগাড়ীর 'স্বচ্ছলতা', প্রকাণ্ড প্রাসাদ প্রভৃতি বাহ্যসম্পদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বেশ বুঝা যায় যে, এখন কলিকাতার এলোপ্যাথিক বা হোমিওপ্যাথিক খ্যাতনামা বড় বড় চিকিৎসকগণ অপেক্ষা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণের পসার-প্রতিপত্তি অধিক না হউক কিন্তু কোন প্রকারে ন্যূন ত নহেই। তাহার পর নিখিল

ভারতবর্ষীয় বৈদ্য মহাসম্মেলন প্রভৃতি ভারত-ব্যাপী আন্দোলন-প্রণালী দিন দিন যেপ্রকার প্রসার লাভ করিতেছে, তাহা দেখিলে কাহার না মনে হয় যে, ভারতে অচিরকালের মধ্যেই আবার আয়ুর্ব্বেদের সমধিক উন্নতি হইবে,—দেশের স্বাস্থ্য, সুখ ও সম্পদ্ আবার ফিরিয়া আসিবে,—মোটা-ভাত মোট-কাপড়ের দেশে সরল ও সুলভ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার প্রভাব আবার সার্ব্বজনীন হইবে। কথাগুলি আপাততঃ বেশ শ্রুতিতৃপ্তিকর ও মুখরোচক বটে তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু ভিতরে তলাইয়া দেখিলে, অন্যরূপই প্রতীত হয়। এই বাহ্য-সৌন্দর্য্যের আবরণের ভিতরে যে কি ভীষণ ও বীভৎস প্রকৃতি খেলা করিতেছে, তাহা একবার সকলেরই দেখা উচিত। আয়ুর্ব্বেদ প্রেমিক প্রত্যেক ব্যক্তির দৃষ্টি যাহাতে এই বিষয়ে পতিত হয় এবং ইহার প্রতীকার কি ও তাহার উপায় কি, তাহা বুঝিয়া জনসাধারণ মিলিয়া শীঘ্র যাহাতে অনুকূল ভাবে মিলিত হইয়া বিহিত কার্য্য করিতে অগ্রসর হন, তাহারই জন্য গুটিকয়েক কথা অনেকেরই শ্রুতিসুখকর না হইলেও আজ বলিব। আর না বলিয়া থাকা চলেনা,—কারণ একথার আলোচনা স্থগিত থাকিলে, আয়ুর্ব্বেদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় হইয়া উঠিবে।

সকলেরই মনে রাখা উচিত যে, আয়ুর্ব্বেদ দোকানদারীর জিনিষ নহে, আয়ুর্ব্বেদবিদ্যা ধনার্জ্জনের জন্য নহে,—অর্থাৎ আয়ুর্ব্বেদবিদ্যা অর্থকরী বিদ্যা নহে, কোন প্রকার অর্থার্জ্জন করিয়া সমাজে গণ্যমান্য হইয়া বিষয়-ভোগ-লালসার চরিতার্থতা সম্পাদন করাই যাহার লক্ষ্য, সেই ব্যক্তি আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রানুসারে চিকিৎসকের পবিত্র পদে অধিষ্ঠিত হইবার যোগ্য নহে।

চরক সংহিতায় উক্ত হইয়াছে—

"বরমাশী বিষবিষং কথিতং তাম্রমেববা।
পীত মত্যগ্নি সন্তপ্তা ভক্ষিতাবাপ্যয়োগুড়াঃ॥
নতু শ্রুতবতাং বেশং বিভ্রতা শরণাগতাৎ।
গৃহীতমন্নং পানং বা বিত্তং বা রোগপীড়িতাৎ॥
ভিষগ্ বুভূষুর্ম তিমান্ অতঃ স্বগুণ সম্পদি।
পরং প্রযত্নমাতিষ্ঠেৎ প্রাণদঃ স্যাদ্ যথা নৃণাম্॥"

তাৎপর্য্য এই যে, সর্প বিষ ভক্ষণ করাও বরং ভাল, কথিত তাম্র পান করিয়া প্রাণ-ত্যাগ করাও বরং শ্রেয়ঃ, সন্তপ্ত লৌহগুড়িকা ভক্ষণ করাও বরং প্রশস্ত, তথাপি আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ বৈদ্যের বেশ ধারণ পূর্ব্বক রোগপীড়িত শরণাগত ব্যক্তির নিকট হইতে অন্ন, পান বা কোনরূপ বিত্ত গ্রহণ করা উচিত নহে। অতএব যে ব্যক্তি প্রকৃত প্রস্তাবে চিকিৎসক হইতে চাহেন, তাঁহাকে প্রাণপণে সেই গুণ-সম্পৎকে অর্জ্জন করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রযত্ন করিতে হইবে,—যাহার প্রভাবে তিনি লোকের প্রাণপ্রদ হইতে পারেন"।

আমাদের দেশের নিতান্ত দুর্ভাগ্য এই যে, আজকাল এইরূপ প্রাণদ অথচ নিঃস্বার্থ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকের সংখ্যা নিতান্ত বিরল হইয়া পড়িতেছে,—স্মরণাতীত কাল হইতে পুরুষ-পরম্পরায় চিকিৎসা করা যাঁহাদের ব্যবসায় ছিল, একটী অসাধ্য রোগের চিকিৎসা করিয়া আসন্নমৃত্যুর করাল-কবল হইতে রোগীকে রক্ষা করিয়া একজোড়া কাপড়, একটী পিত্তলের ঘড়া এবং একটী রজতমুদ্রা দক্ষিণা পাইলেই যাঁহারা যোগ্য পারিশ্রমিক লাভ হইল বলিয়া সন্তোষ অনুভব করিতেন, পুরুষ-পরম্পরার লব্ধক্রিয়া-নৈপুণ্য ও অভি-

জ্ঞতার প্রভাবে যাঁহারা ঔষধ নির্ম্মাণে চিকিৎসা-ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত ছিলেন, সেই সকল কবিরাজের বরণীয় আসনে আজ যাঁহারা উপবেশন করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই পেটের দায়ে চিকিৎসক—একথা কয়জন অভিজ্ঞ ব্যক্তি অস্বীকার করিতে পারেন? কোনপ্রকারে ৩০।৪০ নং গ্রেসে'র প্রসাদে (কাব্যতীর্থ) উপাধিটা হস্তগত করিতে পারিলেই হইল, আর পায় কে? দিন কয়েক কোন খ্যাতনামা কবিরাজ মহাশয়ের বাটীতে অন্নধ্বংসসহকারে 'মাধবনিদান' খানা চোখ-কান বুজিয়া গলাধঃকরণ করিতে পারিলেই বাজীমাৎ! তাহার পরই কলিকাতার কোন একটা জনসংকুল পথের ধারে "গভর্ণমেণ্ট ডিপ্লোমা প্রাপ্ত" "ভূতপূর্ব্ব মহারাজ বিশেষের ভূতপূর্ব্ব গৃহচিকিৎসক" ইত্যাদি আড়ম্বরপূর্ণ বাজে কথায়পূর্ণ সাইন-বোর্ড লিখাইয়া দোকান ঘরে—দ্বারের উপর লটকান আর সঙ্গে সঙ্গে 'বৃহদঙ্গার চূর্ণ' "বৃহদিষ্টকচূর্ণ" ও "বৃহদট্টালিকাচূর্ণ" এই জাতীয় নানাবর্ণ ঔষধপূর্ণ ছোট বড় শিশি-বোতলমণ্ডিত একটী বা দুইটী আলমারী স্থাপন ইহাই যথেষ্ট!—ইহারই প্রসাদে "শত-মারীভবেদ্‌বৈদ্য" হইবার জন্য একটা অদম্য উৎসাহ থাকিলেই হইল! ইহাই হইল—বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক হইবার সর্ব্বজনবিদিত সুলভ-পন্থা।

এই জাতীয় চিকিৎসকগণ কিসে অজ্ঞ, আতুরদিগকে বঞ্চনা করিয়া দুই পয়সা হাতাইতে পারিবেন, তাহারই জন্য কায়মনো-বাক্যে চেষ্টা করিয়া থাকেন। স্কুল-পণ্ডিতী জোটেনা,—বাটীতে চাষবাসের ও কোন সুবিধা নাই,—কেরাণীগিরি করিবারও সামর্থ্য নাই, অথচ ভদ্রবংশোদ্ভব বলিয়া মুটেগিরি করিবারও যো নাই, সামর্থ্যও নাই; সুতরাং কবিরাজী করাই প্রশস্ত! এই ব্যবসায়াত্মিকা-বুদ্ধির দ্বারা যাঁহারা পরিচালিত, অধিকাংশস্থলে তাঁহারাই ত আজ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকের কার্য্যে ব্যাপৃত। এইরূপ ধনলোভে বিবেক-হীন অশাস্ত্রজ্ঞ চিকিৎসানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ যদি আয়ুর্ব্বেদের দোহাই দিয়া সাধারণের চক্ষে ধূলিনিঃক্ষেপপূর্ব্বক অর্থার্জ্জন করিতে সমর্থ হন, তাহাদিগের এই লোক ঠকাইবার কুশলতা দেখিয়া কি বলিব যে, বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রের উন্নতির দিন আবার ফিরিয়া আসিয়াছে? চিকিৎসকের স্বরূপ-বর্ণন-প্রসঙ্গে (চরকসংহিতা) কি বলিতেছে?

"শীলবান্ মতিমান্‌যুক্তো দ্বিজাতিঃ শাস্ত্রপারগঃ।
প্রাণিভিগু রুবৎপূজ্যঃ প্রাণাচার্য্যঃ সহিস্মৃতঃ॥"

সৎস্বভাব, মতিমান্, যুক্তিমান্ ও শাস্ত্রজ্ঞ দ্বিজাতিই প্রাণাচার্য্য বা চিকিৎসক হইয়া থাকেন, এই প্রাণাচার্য্যকে প্রাণীগণ গুরুর ন্যায় পূজা করিবে।

কাহাকে বৈদ্য বলে,—ইহারই উত্তর দিতে যাইয়া চরকসংহিতাকার বলিতেছেন।

"বিদ্যাসমাপ্তৌ ভিষজস্তৃতীয়া জাতিরুচ্যতে।
অশ্নুতে বৈদ্যশব্দং হি ন বৈদ্যঃ পূর্ব্বজন্মনা॥"

"অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যা সম্পূর্ণভাবে লাভ করিলে চিকিৎসক তৃতীয়া জাতি লাভ করিয়া থাকেন, এই বিদ্যালাভ করিবার পূর্ব্বে কেহই বৈদ্যকুলে জন্ম হইয়াছে বলিয়া বৈদ্য হয় না।"

"বিদ্যাসমাপ্তৌ ব্রাহ্ম্যং বা সত্ত্বমার্ষ্যং মথাপি বা।
ধ্রুবমাবিশতি জ্ঞানাৎ তস্মাদ্বৈদ্য দ্বিজঃ স্মৃতঃ॥"

আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যায় পারগত হইলে চিকিৎসক সেই জ্ঞানের প্রভাবে ব্রাহ্ম বা আর্ষ-সত্ত্ব

লাভ করিয়া থাকেন, এই ব্রাহ্ম বা আর্য সত্ব লাভ করিলেই তাঁহার তৃতীয় জন্ম সিদ্ধ হয় এবং তখনই তিনি বৈদ্য নামে অভিহিত হইবার যোগ্য হইয়া থাকেন।

নাত্মার্থং নাপিকামার্থং অথ ভূত দয়াংপ্রতি।
বর্ত্ততে যশ্চিকিৎসায়াং স সর্ব্বমতিবর্ত্ততে ॥

নিজে আরোগ্যের জন্য বা নিজের কামনা চরিতার্থ করিবার জন্য চিকিৎসায় প্রবৃত্ত না হইয়া, যে কেবল ব্যাধিপ্রপীড়িত প্রাণীগণের দুঃখমোচনার্থ দয়াপরবশ হইয়া চিকিৎসা কার্য্যে ব্যাপৃত হয়, সে এই জগতে সর্ব্বাপেক্ষা মহান্ অর্থাৎ সেই প্রকৃত আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক-শ্রেষ্ঠ! ইহাই হইল—আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকের উন্নত আদর্শ। এই আদর্শের প্রতিষ্ঠা আবার এদেশে যতদিন স্থাপিত না হইতেছে, ততদিন আয়ুর্ব্বেদের প্রকৃত উন্নতি সম্ভবপর কি না, তাহা শিষ্টগণই বিচার করুন।

এই জাতীয় চিকিৎসা-শাস্ত্রে-অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ লোক বঞ্চনা দ্বারা আয়ুর্ব্বেদের দোহাই দিয়া যাহাতে আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রের উন্নতি-পথকে কণ্টকাবৃত না করিতে পারে, তাহার জন্য আমাদের দেশে আয়ুর্ব্বেদহিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেরই চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। আজকাল দেশের সর্ব্বত্রই ভেজালের আধিক্য। এই ভেজালের বিড়ম্বনায় পড়িয়া ঘৃত-দুগ্ধ-তৈল প্রভৃতি অত্যাবশ্যক আহার্য্য দ্রব্যগুলি অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িতেছে বা ব্যবহৃত হইলে স্বাস্থ্যহানিকর হইতেছে; তদ্রূপ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকের মধ্যে এই (ভেজাল চিকিৎসকের) অত্যাধিক্যে দেশে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার মূলোচ্ছেদ হইতেছে বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। ইহার প্রতিকার সত্বর আবশ্যক—ইহা কে না বলিবে?

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ।

প্রাচীন ভারতে পাঁউরুটী।

তখনও ট্রেণ ছাড়িবার একটু বিলম্ব ছিল। রৌদ্র-পীত-মধ্যাহ্নে, মধ্যম শ্রেণীর এক কামরায়, মুখোমুখী হইয়া দুই বন্ধুতে বসিয়াছিলাম। রেল-কোম্পানী ট্রেণের সংখ্যা কমাইয়া দেওয়ায়, প্রত্যেক কামরায় অসংখ্য আরোহীর ভিড় হইয়াছিল। বিশেষতঃ তৃতীয় ও মধ্যম শ্রেণীর অবস্থা দেখিয়া, "অন্ধ-কূপহত্যার" অধিনায়ক 'সিরাজকে'ও অনেকটা সহৃদয় বলিয়া মনে হইতেছিল। নিদাঘের উগ্রতাপস মূর্ত্তি দেখিয়া, হাওড়া ষ্টেশনের অমল কোলাহল--মুখর--বিপুল--বিস্তার--'প্ল্যাটফরম্' স্তম্ভিতভাবে পড়িয়াছিল। যাত্রীদের তৃষ্ণা-কাতর-জিহ্বার সম্মুখ দিয়া, "বরফ সরবতের" ঠেলা গাড়ী খানি পুনঃ পুনঃ আনাগোনা করিতেছিল।

সহসা আমাদের কামরার দ্বারে এক জীবিত-কঙ্কাল-বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ উপস্থিত। তাঁহার শিরা-বহুল-জীর্ণ-হস্তে এক বিরাট 'পুঁটলী' ঝুলিতেছিল। একে দারুণ গুমোট—তাহাতে গাড়ীর মধ্যে 'তিল-ধারণের'ও স্থান ছিল না,—আরোহীদলের মধ্যে ৫।৭জন উঠিয়া গাড়ীর দ্বার চাপিয়া ধরিয়া ব্রাহ্মণের প্রবেশে বাধা